গ্নু-লিনাক্স ইশকুল

জিএলটি মধ্যমগ্রাম
glt-mad@ilug-cal.org

আমরা আমাদের গ্নু-লিনাক্স ইশকুলের পড়াশুনো শুরু করতে যাচ্ছি — লিনাক্স শিখে ফেলব এখানে, তা নয়। লিনাক্স কী ভাবে শিখব সেটা শেখার চেষ্টা করব। আজ আমরা আসলে সেটাও করব না, এটা শূন্য নম্বর দিন, পরের এক নম্বর দিন থেকে আমরা যেগুলো শুরু করব তার একটা ভিত খুঁড়ে নেওয়ার চেষ্টা করব আজকে। যে কোনো একটা বড় সক্রিয় তীব্র আর জ্যান্ত কাজের বা বিদ্যার এলাকায় যা হয় — শেখাটাই হয়ে দাঁড়ায় নিজের একটা গবেষণা। প্রত্যেকটা ছাত্র আসলে তার নিজস্ব স্বতন্ত্র একখানা বিদ্যা শেখে। কিন্তু এই শেখাটায় পৌঁছনোর জন্যে কিছু মকশো করা লাগে, কিছু বাঁদরের মুখ ভ্যাংচানোর মত নকল, কিছু হাতড়ানো, কিছু লাগে-তাক-না-লাগে-তুক, কিছু ব্রুট ফোর্স মানে গাজোয়ারি, কিছুটা নার্ভাস হয়ে যাওয়া — বেশ কয়েক কোটি বার মনে হওয়া — ধুর এতো শালা কিছুই পারছি না। তারপর হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করা, আরে, বেশ তো পারছি। কাজটা তো কেমন হয়ে গেল। জানিনা, এর থেকে অন্যরকম, এর থেকে ভালো কোনো শেখা থাকতে পারে। কিন্তু আমি সেখানে কাউকে কোনো পরামর্শ দিতে পারব না। কারণ, আমি সেটা জানিনা, আমি নিজে যেরকম ভাবে করেছি, উত্তেজিত হয়েছি, বারের পর বার ধেড়িয়েছি, তারপর আকস্মিকভাবে মিলে গেছে, আমি ঠিক সেটাই রাখছি এখানে, যদি অন্য আর কারুর এতে কোনো সাহায্য হয়। শুধু যে আমি কোনদিন প্রথাগতভাবে সত্যিকারের ঠিক মতো উপায়ে কম্পিউটার শিখিনি তাই নয়, কম্পিউটার আমার নিজের এলাকাও না, আমার কাছে প্রায় এক দশক আগে কম্পিউটার এসেছিল একটা ঝিনচাক টাইপরাইটার হয়ে — কোথাও জানতাম যে এতে লেখার, লিখে চলার এবং সেই লেখা অন্যকে পড়ানোর গোটা প্রক্রিয়াটাই সহজতর হয়ে যাবে। তখন শুরু করেছিলাম উইনডোজে। তারপর অল্প কিছু দিন হল আমার গ্নু-লিনাক্সে আসা। যে অভিজ্ঞতাটা আমার কাছে এত নাটকীয় এবং উত্তেজক যে, মাঝে মাঝেই মনে হয়, এত পরে কেন, এত বেশি বয়সে কেন? আগে হলে কী ভালো হত। তাই, আমার তৈরি করা নোট পড়াটা সত্যিকারের ভালো কম্পিউটার শেখার পক্ষে কতটা ভালো সে বিষয়ে আমার নিজেরই সন্দেহ আছে। সামনাসামনি যারা জিএলটিতে আসছে তারা তবু বুঝে নিতে পারে — কতটা ধরবে আর কতটা ছাঁটবে। ছাঁটার প্রয়োজন থাকবে প্রচুর — সেই স্কুলজীবনেই শিলাদিত্য বলেছিল — একটা লোক এত উৎকেন্দ্রিক হয়? (ও সাংস্কৃতিক ছেলে বলে একসেনট্রিক বলত-না) আমার সেই কেন্দ্র থেকে উৎক্ষিপ্ততা তো আমার লেখা টেক্সট-এ থাকবেই, গত বিশ বছরে আমার প্রত্যেকটা লেখাতেই থেকেছে। প্লিজ, পড়ে ক্ষিপ্ত হবেন না। বরং, লিনাক্সের যেটা চালু প্রথা, কমিউনিটিকে ফিরিয়ে দাও তুমি যা পেয়েছ, সত্যিকারের ভালো কেজো এবং শিক্ষিত একটা লেখা লিখে ফেলুন। আপনারা তো অনেকেই আছেন যাদের কাজের এলাকাই কম্পিউটার — কতো ভালো করে জানেন, একদম ভিতর থেকে, আপনাদের কাছে কাজটা আরো অনেক সহজ। আমার কাছেও গ্নু-লিনাক্স-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা এটা — আমাদের মত গরিব দেশে গ্নু-লিনাক্সটা প্রথম বিশ্বের চেয়ে আরো হাজারগুণ জরুরি। ট্রেন ইস্টিশনে যখন লোককে শুয়ে থাকতে দেখেন খালি পেটে, হাসপাতালে দেখবেন লোকে বেড পাচ্ছেনা, চাঁদের মত মুখ নিয়ে ছবছরের বাচ্চা রাস্তার পাশে চারবছরের বাচ্চাকে কোলে নিয়ে ভিক্ষে করছে — তখন নিজেকে মনে করাবেন কথাটা।

।। দিন শূন্য ।।

০.০ ।। সামনে একটা আস্ত পিসি

সবার হয় কিনা জানিনা, প্রথমবার সামনে একটা আস্ত পিসি দেখে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছিল। এটা একটা কম্পিউটার — এটা নিয়ে এখন আমি যা-খুশি করতে পারি? এর পরের স্টেপে আসে — কোন যা-খুশি-টা করা যায় কোনটা যায়না — সেটা বোঝার চেষ্টা করা। এইখানে প্রথম যেটা দরকার পড়ে — একটা কম্পিউটারের গঠনটাকে বোঝা। আমরা এই প্যারাগ্রাফে পিসি মানে পার্সোনাল-কম্পিউটার আর কম্পিউটার সমার্থক হিশেবে ব্যবহার করছি, কিন্তু পরে আমরা দেখব এখানে আরো অনেক অষ্টাশি মজা আছে।

কম্পিউটারটা পার্সোনাল কি ইম্পার্সোনাল কি সোশাল কি অ্যান্টিসোশাল সেটা বড় কথা না, পার্সোনাল কম্পিউটার একটা বিশেষ ধরনের কম্পিউটারের নাম, এবং আমাদের বেশিরভাগেরই কম্পিউটারে হাত-পাকানো শুরু হয় এই মেশিনেই। আসুন আমরা একটা আমাদের প্রতিদিনের অভ্যস্ত পিসির গঠনটার সঙ্গে অভ্যস্ত হই। ঠিক যেরকম আমরা টেবিলের ওপরে দেখি। এর দৃশ্যমান অংশগুলোকে আর একবার খেয়াল করে নিই। দুপাশে দুটো সাউন্ডবক্স। সামনে কিবোর্ড আর মাউস। পাশে টাওয়ারটা। যার সামনে থেকে দেখা যাচ্ছে সিডি-ড্রাইভ আর ফ্লপি-ড্রাইভটা, আর দু-একটা আলো বা কোনো ছোটখাটো ডিসপ্লে। আর প্রায় সব মেশিনেই সামনে দু-একটা সুইচ, যার একটার পাশে অনেকক্ষেত্রেই লেখা ‘রিসেট’। আর সবার উপরে মাথা তুলে আছে কনসোল। আমার দেড়বয়স্ক ভাগ্নে বিরক্ত হয়ে বলেছিল — তোমার টিভিতে সিনেমা হয়না? হয় যে, সেটা আর আমি বলিনি, এখনো আমি অত পাগল নই।

মজার কথা কি বলুন তো — আসলে কম্পিউটারটা কিন্তু অদৃশ্যই হয়ে রয়েছে — প্রায় পুরোটাই। ধরুন, আপনার একটা একটা করে আঙুল চুল ঠোঁট জামা গলার শব্দ স্বপ্ন সব ছেঁটে ফেলা হচ্ছে — কতক্ষণ অব্দি আপনি আপনাকে ‘আপনি’ হিশেবে টিকিয়ে রাখতে পারেন — তার একটা এক্সপেরিমেন্ট। কোন কোন পার্টটুকুতে কেন্দ্রীয়তম ‘আপনি’ বসবাস করেন সেটা আমরা খুঁজছি। আপনার ক্ষেত্রে এই কাটাকাটিটা যতটা জটিল আপনার পিসির বেলায় তা-নয়। তাকে পার্টে পার্টে পিসপিস করে ফেলা যায়, পরে আমরা একটু আধটু সেটা করব-ও। সেই পার্টগুলোর ভিতর সবচেয়ে জরুরি যেটা পাব সেটা প্রসেসর মানে মাইক্রোপ্রসেসর চিপ। এটা থাকে টাওয়ারের ভিতর, মাদারবোর্ডের গায়ে সাঁটা। এই মাদারবোর্ড সত্যিই সবগুলো আভ্যন্তরীন অংশেরই মাদার, সবাইকেই ধরে রাখে। মাদারবোর্ডের গায়েই সাঁটা থাকে কম্পিউটারের দ্বিতীয় জরুরিতম অংশ — মেমরি বা স্মৃতি। এর পর থাকে হার্ড ডিস্ক, যাকে বলাই যায় যে কম্পিউটারের তৃতীয় জরুরিতম অংশ। এছাড়া টাওয়ারের মধ্যে থাকে বিভিন্ন অ্যাডাপ্টার সহ অ্যাডাপ্টার কার্ড। যা যা দিয়ে আপনার পিসি জন্মেছিল, যে সমস্ত হাত-পা-চুল-লেজ ইত্যাদি, তার বাইরে আরো নানা হাত-পা-চুল-লেজ মায় মুন্ডুও অ্যাডাপ্ট করে, লাগিয়ে নেয় নিজের সঙ্গে এই অ্যাডাপ্টার কার্ড দিয়েই। ইস, আমাদেরও যদি এরকম হত। বিশেষ করে একটা সাপ্লিমেন্টারি মুন্ডুর প্রয়োজন প্রায়ই এত বোধ করি। টাওয়ারের মধ্যে এছাড়াও থাকে বৈদ্যুতিক যোগাযোগের একটা গম্ভীর কালো চৌকো বাক্স — ধাতুর পাতের। গ্রীক পুরানের মেডুসার মাথার মত যার থেকে বেরিয়েছে কোটি কোটি তার। আর থাকে দুটো বা তারো বেশি ফ্যান — শোঁ শোঁ আওয়াজ করে, মেশিন চলে যখন।
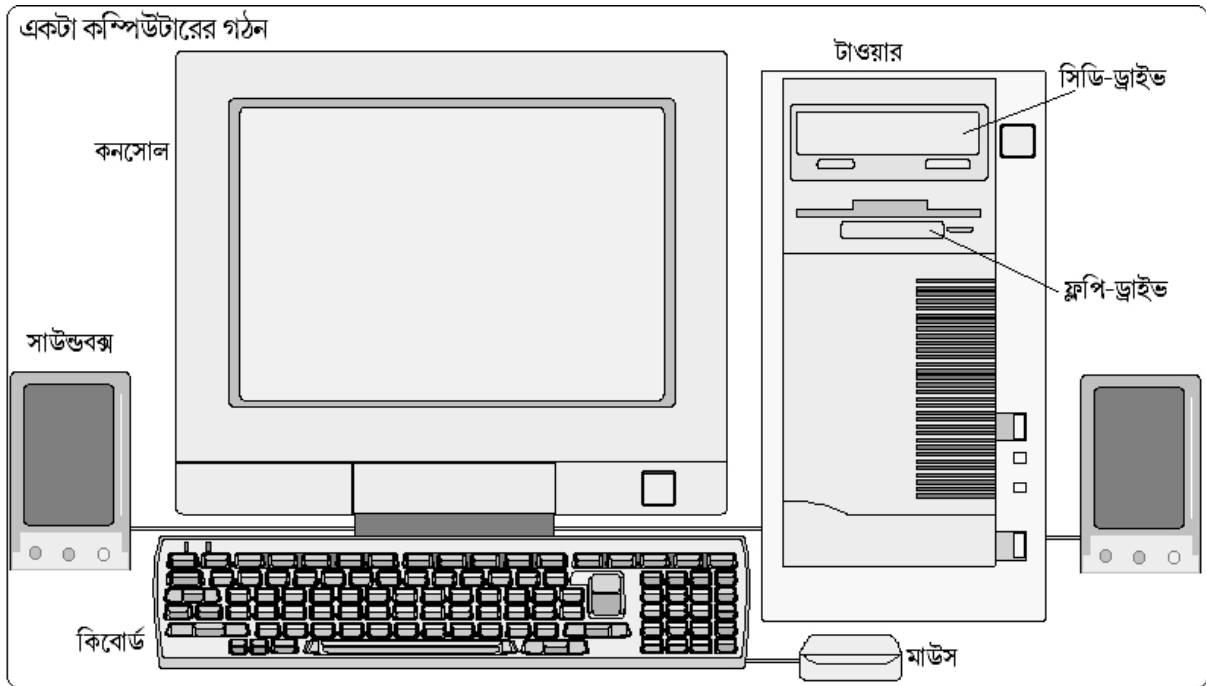
বাইরে থেকে যেগুলো দেখা যাচ্ছে, তার মধ্যে খুব জরুরি হল কনসোল আর কিবোর্ড। কিবোর্ড থেকে কম্পিউটারে নানা আদেশ পাঠাতে হয় — নইলে ব্যাটা চলবে কী করে। আর কনসোলে ফুটে ওঠে সেই আদেশগুলো এবং সেই আদেশ পাওয়ার পর কম্পিউটার যা যা করল তার ফলাফল। এই কিবোর্ডেরই একটা বিকল্প মাউস বা ইঁদুর। আমরা কিবোর্ডে আদেশ দেওয়ার বদলে যখন মাউস দিয়ে আদেশ দিই, তখন, পিছনে, আমাদের অগোচরে মাউস দিয়ে দেওয়া আদেশগুলোকে বদলে ফেলে কম্পিউটার, কিবোর্ড থেকে দেওয়া আদেশের আকারে নিয়ে আসে। সেই ব্যবস্থা করা থাকে কম্পিউটারে। পিছনে পিছনে মাউসের আদেশগুলোকে সে কিবোর্ডে টাইপ করা আদেশের মতো চেহারায় অনুবাদ করে নেয়, রূপান্তরিত করে নেয়। পরে আমরা একটু একটু করে বুঝব এসব।

এর বাইরে যেটা এই ছবিতে আছে তা হল সাউন্ডবক্স দুটো। এখন এটা পিসির বেলায় প্রায় একটা মাস্ট হয়ে গেছে। গান শোনার, মাল্টিমিডিয়া চালানোর জন্যে। মাল্টিমিডিয়া বলতে মাল্টিপল মিডিয়াম যেখানে একসঙ্গে চলছে, নানা ধরনের ফাইল, তৈরি করছে ছবি আর শব্দ। ছবিটা আসছে কনসোলে। আর শব্দটা এই সাউন্ডবক্সে। যেমন এটা লিখছি আর সাউন্ডবক্সে বাজছে দিলীপ রায়ের ‘পুষ্প উছল গাহে কাননে কোকিলা, শ্রাবণবাদল ছায় নভে’, আর এইসব বেজার লেখা লিখতে লিখতে ভাবছি কখন এসব থামিয়ে হিন্দুস্তানির ‘টেলিফোন-ধুনমে হাঁসনেওয়ালি’ দেখতে পারব — তখন গানের সঙ্গে সঙ্গে চলবে কমল হাসান আর মনীষা কৈরালার চলৎছবি, শঙ্করের দুর্ধর্ষ ক্যামেরায়।

এই যে অংশগুলোর কথা বললাম এগুলোর প্রত্যেকটারই নিজের নিজের কাজের ভিত্তিতে কম্পিউটারের মধ্যে একটা নিজস্ব ভূমিকা আছে। এবার কম্পিউটারের সেই কাজের ভিত্তিতে গঠনটা বোঝার চেষ্টা করা যাক। গোটা কাঠামোটা একটু একটু করে আমাদের কাছে ফুটে উঠবে, এই একই ছকের আলোচনায় আর একবার ফিরে আসব আমরা এই পাঠমালার শেষ মানে দশ নম্বর দিনে, মানে এগারো নম্বর চ্যাপ্টারে, ভন নয়মান আর্কিটেকচারের আলোচনায়।

০.১।। কাজের ভিত্তিতে একটা কম্পিউটারের গঠন

এই চিত্রে কম্পিউটারের অংশগুলোকে তাদের কাজের ভিত্তিতে দেখানো হয়েছে — আগের পার্সোনাল কম্পিউটারের ছকের
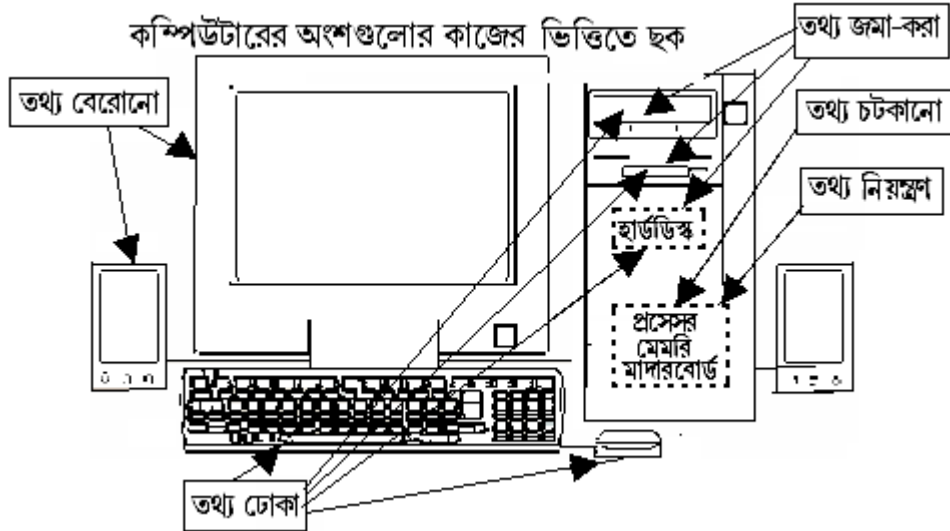
সঙ্গে মিলিয়ে পড়ুন। সেই ছকে দেখানো কনসোল, কিবোর্ড, মাউস, টাওয়ার ক্যাবিনেট, ফ্লপি ড্রাইভ, সিডি ড্রাইভ, সাউন্ড-বক্স ছাড়াও এখানে সছিদ্র দাগের ভিতর দেখানো হয়েছে প্রসেসর, মেমরি, মাদারবোর্ড এই তিনটেকে একসঙ্গে — যারা তথ্য চটকানো বা প্রসেসিং এবং নিয়ন্ত্রণ বা কন্ট্রোল — এই দুটো কাজে অংশগ্রহণ করে। অন্য সছিদ্র দাগের মধ্যে দেখানো হয়েছে হার্ডডিস্ককে, যে অংশ নেয় তথ্য জমা-করা এবং তথ্য ঢোকানো — এই দুটো কাজে। এই দুটো সেটকে সছিদ্র দাগের ভিতর দেখানোর কারণ এই যে এদের বাইরে থেকে দেখা যায়না। আগের ছবির সঙ্গে মেলান। তথ্য ঢোকানোর কাজ করে কিবোর্ড, মাউস, ফ্লপি ড্রাইভ, সিডি ড্রাইভ আর হার্ডডিস্ক ড্রাইভ। তথ্য বার করার কাজ করে কনসোল আর সাউন্ডবক্স। এখানে আমরা হাতে গোনা এই কয়েকটা মাত্র উপাদান দেখিয়েছি। বাস্তবে সম্ভাব্য উপাদানের সংখ্যা তো হাজারে হাজারে।

একটা কম্পিউটারকে কম্পিউটার-সমাজে কম্পিউটার হিশেবে মুখ দেখাতে গেলে কিছু কেজো অংশ থাকতেই হবে। কাজের যুক্তির ভিত্তিতে এই গঠনটা এইরকম —

১।। ডেটা ইনপুট বা তথ্য ঢোকা। মানে তথ্য এবং আদেশ মেশিনে ঢোকা। আপনি আপনার চালের এবং ডালের এবং সিগারেটের খরচ কম্পিউটারে ঢোকালেন — এটা তথ্য। তাদের যোগ করতে বললেন, স্ক্রিনে দেখাতে বললেন — মাস থেকে মাসে তাদের চলমান হিশেবটা — এটা আদেশ। তথ্য বা আদেশ ঢোকানোর কাজটা করলেন কিবোর্ড মাউস ইত্যাদি দিয়ে। সেগুলো হল ইনপুট ডিভাইস, তাদের কাজ কম্পিউটারে তথ্য ঢোকানো। পরে আমরা দেখব, শুধু এই দুটো ডিভাইসই নয়, অন্য ডিভাইসও এই কাজে ব্যবহার করা যায়। কাজ এবং ডিভাইস বা উপাদানগুলোর মধ্যে প্রায় কোনো ছুতমার্গই নেই, পরে একটা টেবিল করে দেখব আমরা, প্রায় সব ডিভাইসই একের বেশি কাজে ব্যবহার করা যায়।

২।। ডেটা আউটপুট বা তথ্য বেরোনো। কম্পিউটার কনসোলে কিম্বা প্রিন্টারে প্রিন্টরত পাতায় হিশেবটা বেরিয়ে এলো। যা বেরিয়ে এল সেটা তথ্য। যেখানে বেরিয়ে এল মানে সেই কনসোল বা প্রিন্টার হল আউটপুট ডিভাইস। যদি আউটপুট একটা ফ্লপিতে লিখে নেন, বা একটা সিডিতে পুড়িয়ে নেন, তখন সেটাই হয়ে দাঁড়াল মেশিন থেকে তথ্য বার করার আউটপুট ডিভাইস।

৩।। ডেটা প্রসেসিং বা তথ্য চটকানো। আমার ঢোকানো তথ্যগুলোকে আমারি ঢোকানো আদেশ মোতাবেক চটকানো বা প্রসেসিং — এটাই কম্পিউটারের মোদ্দা কাজ। খেয়াল করুন। পরে, তিন আর চার নম্বর দিনের আলোচনায় দেখবেন, কম্পিউটার ব্যাপারটাই গজিয়ে উঠেছে এই সংখ্যা চটকানোর কাজের বিবর্তনকে ঘিরে। এটাই কম্পিউট করা মানে হিশেব করা, যা কম্পিউটারকে কম্পিউটার নামটা দিয়েছে। আর সব কাজই হল এই কাজটার জুতো টুপি টাই ইত্যাদি, মানে এটা করতে গিয়ে আর যা যা লাগে। যদিও এখন, আজকের পৃথিবীতে, কম্পিউটারে হিশেব করার কাজ প্রায় অনুপস্থিত বললেই হয়। মোট জ্যান্ত মেশিনের ক-পিস আর ব্যবহার হয় সংখ্যা চিবোনোর কাজে? বরং তথ্য সম্প্রচার বা ডেটা কমিউনিকেশন আর সেই কমিউনিকেশনের জন্যে দরকারি তথ্য তৈরি করা, ডেটা জেনারেশন, এতেই ব্যবহার হয় বেশিরভাগ মেশিন। আপনি একটা প্রবন্ধ লিখলেন, পড়তে পাঠালেন লোককে ইমেল করে — গোটাটাই তথ্য সম্প্রচার, আবার ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে আপনি একটা মুভি ক্লিপ দেখলেন, তার মানেও তথ্য সম্প্রচার। কিন্তু হিশেব মানে সংখ্যা নিয়ে কাজ করা থাকুক আর না-থাকুক, কম্পিউটারের মূল কাজই হল তথ্য চটকানো বা ডেটা প্রসেসিং। এর থেকে মুক্তি নেই বেচারার। প্রোগ্রাম মারফত আমার দেওয়া আদেশে আমার ঢোকানো তথ্য চটকানো। মানে আমারি দেওয়া শিলে আমারই দেওয়া নোড়া, কম্পিউটার এবার পিন্ডি চটকালো — নইলে ওই পিণ্ড পিণ্ড তথ্য বেরিয়ে আসবে কী করে কনসোলে বা প্রিন্টারে।

৪।। ইনফর্মেশন হোল্ডিং বা তথ্য জমানো। তথ্য যদি চটকাতে হয়, তাহলে তথ্য কোথাও, যতটুকু সময়ের জন্যেই হোক, তাকে তুলে রাখতে হবে। অনুপস্থিত তথ্য আপনি চটকাবেন কী করে? এই তুলে রাখাটা অল্প এককুচি সময়ের জন্যে হতে পারে, চোখের পলক ফেলার মধ্যে কাজ খতম। একটু বাদেই আমরা দেখব, এই কাজটা র‍্যাম করে। আবার, আপনি যুগান্তকারী যে প্রবন্ধটা লিখলেন সেটা পরবর্তী সহস্রাব্দেও যাতে হারিয়ে না-যায়, তার জন্যে আপনি একটা সিডিতে পুড়িয়ে সেটা ব্যাঙ্কের লকারে রেখে দিলেন, এবং ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে বলে দিলেন, যেন আগামী দু-এক হাজার বছর এটা তুলে রাখে। দু-এক হাজার বছর পরে সিডিটা যদি থাকে, তাতে আপনার তথ্যটাও তোলা রইল। বার করে কম্পিউটারে ভরা মাত্র আবার সেটা চটকানো যাবে। তবে ততদিনে আমাদের চেনা অবয়বের কম্পিউটার আর সিডি থাকবে মিউজিয়ামে, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাওয়া জিনিষপত্র আমরা যেমন সাজিয়ে রাখি। তথ্য ধরে রাখাটা হয় নানা রকম। ধরুন, হিশেব করছেন, হিশেব চলাকালীন হিশেবের প্রতিটি সংখ্যাকে মনে রাখতে হচ্ছে মেশিনের, ভুলে গেলে তো হিশেবটাই আর হবেনা। এটা হল চকিত কটাক্ষের স্মৃতি কয়েক লহমার জন্যে ধরে রাখা, মানে র‍্যাম বা ভার্চুয়াল মেমরি, আসছি আমরা একটু বাদেই। আবার ধরুন, পরপর আপনি অনেকগুলো মাসের হিশেবের সমগ্রটা একসঙ্গে দেখছেন, তার মানে আগের মাসের তথ্যগুলোও মেশিনকে কোথাও তুলে রেখে দিতে হয়েছে — সচরাচর এই কাজে হার্ডডিস্ককে ব্যবহার করা হয়, তবে অন্য উপাদানও ব্যবহার করা যায়। মানে, নানা রকম তথ্য নানা ভাবে তুলে রাখতে হচ্ছে মেশিনকে তথ্য চটকানোর কাজটা করতে গিয়েই। এটাই হল ইনফর্মেশন হোল্ডিং বা তথ্য ধারণ।

৫।। কন্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ। কোন অংশটা কোথায় কী করে চলেছে তার উপর একটা নিয়ন্ত্রণ তো থাকতে হবে। এইখান থেকে তথ্য পড়ো, এইখানে থামাও। এতটা অব্দি ঢোকাও। এতটা অব্দি এই ভাবে চটকাও। এইবারে এই অব্দি ফলাফলটা বার করে দাও এই ভাবে এবং এইখানে। এই কাজটাকে খেয়াল করুন, আলাদা করে খেয়াল করুন, কারণ কাজটার সঙ্গে অন্য কাজগুলোর একটা ব্যাপক প্রভেদ আছে। একটা তত্ত্বগত ঝাঁকুনি আছে। অন্য কাজগুলো আমাদের অভ্যস্ত ধাঁচের — কম্পিউটার নামক মেশিন এবং তথ্যের মধ্যেকার কাজ। আগের চারটে কাজই ভাবুন, যা ক্যালকুলেটরও করে। ক্যালকুলেটরের কিপ্যাড ইনপুট নেয়, ডিসপ্লে প্যানেলগুলো আউটপুট দেয়, মেমরি প্লাস বা মেমরি মাইনাস করে আমরা মেমরিতে রাখা সংখ্যাগুলো দেখি, মানে একটা মেমরি বা তথ্য ধারণও আছে, অফ করলেই যা উড়ে যায়। এবং তথ্য চটকানো তো আছেই, সেটাই তো কাজ ক্যালকুলেটরের। ধরুন আপনি '2' আর '3' যোগ করলে যে '5' হয় এটা ক্যালকুলেটরের কাছ থেকে জানতে চাইছেন, তার মানে '2' আর '3' এই দুটো আঙ্কিক তথ্যকে চটকে ফলাফল '5' বার করছে ক্যালকুলেটর। এটা করে ক্যালকুলেটরে বৈদ্যুতিন বা ইলেকট্রনিক সার্কিট অংশটা। কিন্তু, এই পাঁচ নম্বর মানে নিয়ন্ত্রণের কাজটা ক্যালকুলেটরের কোন অংশটা করছে? ভাবুন, খুব ভাবুন। পারছেন ভাবতে? কোন অংশটা? পারবেন না, কারণ, এই কাজটা ক্যালকুলেটর করছেই না। করছেন আপনি, আপনার মাথায় ভরা আছে, কী কী সুইচ টিপতে হবে, '2', '+', '3' — এই অব্দি টেপার পর তথ্য দেওয়া আর তাদের কী করতে হবে সেই বলাটুকু শেষ হল, এবার টিপতে হবে '=', মানে এবার আপনি হিশেব করতে বললেন। এখুনি হিশেব শেষ করতে না-বলে যদি আরো যোগ করতে চাইতেন তখন আপনাকে আবার টিপতে হত '+', এবং তারপর আবার কোনো সংখ্যা। তার মানে নিয়ন্ত্রণটা কে করছে? আপনি। কী করবেন সেটা কোথায় রয়েছে? আপনার মাথায়। প্রোগ্রাম কাকে বলে? যা দিয়ে আপনার মাথার মধ্যে থাকা ওই নিয়ন্ত্রণের কাজটা কম্পিউটারের হাতে দিয়ে আপনি প্রাণের সুখে লেজ দোলাতে পারেন। বাই চান্স, লেজ যদি না থাকে, এই সমস্যাটা হতেই পারে, আমারো তো নেই বলেই জানি, মুন্ডু দোলান মৃদুমন্দ হাওয়ায়, একই আরাম পাবেন। কিন্তু কাজটার পার্থক্যটা খেয়াল করলেন কী? এটা একটা কাজ যা আর তথ্য আর মেশিনের মধ্যের দেওয়া নেওয়ার স্তরে নয়, এটা হল তথ্য আর মেশিনের মধ্যেকার কাজগুলোকে নিয়ন্ত্রণের কাজ। মানে টেকনিকাল চ্যাংড়ামো করে বলা যায়, মেটাকাজ, কাজের বিষয়ে কাজ। এই গোটাটা নিয়ে বিশদ করে আলোচনায় আসব আমরা এই পাঠমালার শেষ দিনে মানে দশ নম্বর দিনে।

কম্পিউটারের যৌক্তিক গঠনের এই ছকটা মেনেই এবার বিভিন্ন ভৌত উপাদান বা ফিজিকাল ডিভাইসগুলো লাগানো এবং ব্যবহার করা হয়। সেই খুঁটিনাটিগুলো এবার একটু ধরা যাক।

০.২।। ইনপুট বা কম্পিউটারে তথ্য ঢোকা

ইনপুট বা তথ্য ঢোকানোর যে উপায়টা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় সেটা কিবোর্ড। এই কিবোর্ড জিনিষটা আমাদের অভ্যস্ত — প্রতিদিনের। কিন্তু আজ আমরা যে চেহারায় কিবোর্ডকে দেখি তার একটা স্বতন্ত্র ইতিহাস আছে। সেটা এক দিনে আসেনি। এবং কিবোর্ডের চেহারা শুধুমাত্র ওই একটাই নয়। আরো একাধিক রকমের হয়। আমরা যে কিবোর্ডে অভ্যস্ত তাকে বলে কোয়েরটি কিবোর্ড। এই নামটা এসেছে কিবোর্ডের নিচের যে ব্লকটা — মানে অক্ষরের ব্লক, তার একদম উপরের ছ-টা অক্ষরের নাম নিয়ে — 'Q', 'W', 'E', 'R', এবং 'T'। নাম থেকে মিলিয়ে নিন।

কোয়েরটি কিবোর্ড।। কোয়েরটি বা QWERTY কিবোর্ড লেআউট হল আমাদের অভ্যস্ত কিবোর্ডের চাবির সজ্জা। এর বাইরে

কোয়েরটি (QWERTY) কিবোর্ড লে-আউট

বর্ণমালার সংস্থান, এখানে সংখ্যা দেখানো নেই

অন্যরকম হয় — যেমন ভোরাক। এটা আমি বই থেকে জানি। আজ পর্যন্ত কখনো চোখে দেখিনি। তবে নেটে একটা কোনো

লেখায় পড়েছিলাম যে ওই ভোরাক বোধহয় আরো শরীর সংস্থানের বিজ্ঞান মোতাবেক তৈরি। কোয়েরটি নামটা এসেছে এই কিবোর্ডের বর্ণমালাটুকুর উপরে বাঁদিকের ছ-টা চাবি মিলিয়ে।

তবে কিবোর্ডে লে-আউট কেবলমাত্র এই একটাই নয়। শুনেছি যে, ভোরাক কিবোর্ডটা এই কোয়েরটির চেয়ে ব্যবহারবিধির বিজ্ঞান বা এর্গোনমিক্স অনুযায়ী অনেক বেশি সঠিক। এর্গোনমিক্স মানে মানুষের ব্যবহার্য বস্তুগুলোর আকার আকৃতি প্রকৃতি বিষয়ক বিজ্ঞান — যাতে করে মানুষ সবচেয়ে সুস্থ রকমে, সবচেয়ে কম ক্লান্তিতে সবচেয়ে বেশি কাজ করতে পারে। আমাদের চোখের সামনে আমরা সবচেয়ে নাটকীয় এর্গোনমিক বদল দেখেছি চেয়ারের আকৃতিতে। আজকাল চেয়ার তৈরিই হয় মেরুদণ্ড তথা শরীরের সুস্থতার কথা মাথায় রেখে — এই ডিজাইনগুলো এর্গোনমিক।

ভোরাক কিবোর্ড।। এই কিবোর্ড লে-আউট তৈরি করেন অগাস্ট ভোরাক এবং উইলিয়ম ডিলি, ১৯৩৬-এ, তখন ব্যাপকভাবে

জনপ্রিয় কোয়েরটি কিবোর্ডের বদলি হিশেবে — আরো দ্রুত যাতে টাইপ করা যায়। এতে চাবিগুলোও সেইভাবেই বসানো হয়েছিল। সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত অক্ষরগুলো যাতে সবচেয়ে সহজে, মানে সবচেয়ে কম আঙুল নাড়িয়ে পাওয়া যায়। যে অক্ষরগুলো প্রায়ই জোড়ায় জোড়ায় আসে তাদের পরস্পরের থেকে দূরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল — যাতে আলাদা আলাদা হাতে তাদের পাওয়া যায়।

যে চেহারায় আজ আমরা কিবোর্ডকে দেখি তার মধ্যেও একটা দীর্ঘদিনের কম্পিউটার হার্ডওয়ার এবং সফটওয়ার বিবর্তনের ইতিহাস লুকিয়ে আছে। এখানে ছবিতে সেটা একটু দেখানোর চেষ্টা করলাম। এই ইতিহাসটা বেশ দীর্ঘ এবং আকর্ষনীয়। কিন্তু আমাদের এই পাঠমালার এক্তিয়ারের বাইরে। বাজারের এবং প্রযুক্তির বদলের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তাপ্রক্রিয়ার বদলের বেশ একটা চমৎকার গ্রাফ পাওয়া যায় তাতে।

আইবিএম এনহান্সড কিবোর্ড। ১০১/১০২ খানা চাবির। এই এনহান্সড কিবোর্ড এসে পুরোনো পিসি আর এটি কিবোর্ডকে

সরিয়ে দিয়েছিল। এতে ওই ১২ খানা এফ সুইচ আছে। এর আগে থাকত বাঁ-দিকে দশ খানা ফাংশন চাবি। এছাড়া এই এনহান্সড কিবোর্ডে নতুন এলো কনট্রোল (Ctrl) এবং অল্ট (Alt) চাবি। এবং এলো নিউমেরিক প্যাড এবং ওই অন্যান্য চাবি আর আলোগুলো। এই আইবিএম এনহান্সড এবং অ্যাপল এক্সটেন্ডেড কিবোর্ড দুটো প্রায় একই।

অ্যাপল এক্সটেনডেড কিবোর্ড।। ১০৫ খানা সুইচের। এই কিবোর্ড থেকেই অ্যাপল প্রথম উপরে এফ-সুইচের সিরিজ আমদানি করে পিসি কিবোর্ডে, এফ ১ থেকে এফ ১২, আইবিএম মেশিনে যা আগে থেকেই ছিল। পরে আমরা দেখব এই এফ সিরিজ

১০৬ চাবির অ্যাপল এক্সটেনডেড কিবোর্ড
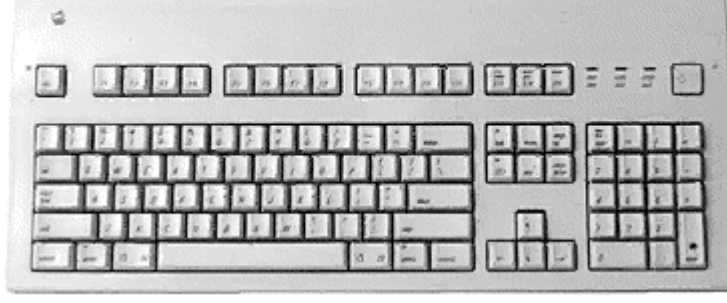
ভীষণ বেশি ভাবে ব্যবহার হয় লিনাক্সে, ভৌতিক বা ভার্চুয়াল টার্মিনালের ব্যবহারে। এই এফ সিরিজ এবং কোন সুইচ কোথায় কতটা জায়গা নিয়ে থাকবে এই লে-আউট এবং নিউমেরিক প্যাডের, অল ক্যাপস সুইচের বা স্ক্রোল-লক সুইচের সঙ্গে আলো — এই গোটাটা মিলিয়ে — এই কিবোর্ড আর আইবিএম এনহান্সড কিবোর্ড বা তার যে প্রতিরূপগুলোর সঙ্গে আমরা সচরাচর

আমাদের খুব চেনা কিবোর্ড

অভ্যস্ত — এরা প্রায় একই। এদের ড্রাইভারগুলোও কাজ করে প্রায় একই রকমে। যা কিন্তু ভোরাক কিবোর্ডের বেলায় সত্যি না। ভোরাকটা ভয়ানকভাবে আলাদা। ছবিতে দেখুন।

তবে শুধু কিবোর্ড কেন, ইনপুট বা কম্পিউটারে তথ্য ঢোকার কাজটা এমনকি হার্ড ডিস্ক থেকেও হতে পারে। কোনো একটা ফাইলে হয়ত রয়েছে তথ্যটা। সেখান থেকে নিয়ে এলাম মেশিনের জ্যান্ত প্রক্রিয়ায়। তথ্যটা আসতে পারে ফ্লপি ডিস্ক থেকে। অন্য কোনো মেশিনে কাজ করা হয়েছিল — সেখান থেকে ফ্লপিতে করে নিয়ে আসা হয়েছে। বা আগের বার কাজ করার পর ফাইলটা ফ্লপিতেই সেভ করা হয়েছিল, রেখে দেওয়া হয়েছিল। তথ্য ঢোকানোর আর একটা উপায় সিডি। সিডিটাকে পুরে দিলাম সিডি-ড্রাইভে, সিডিতে আগে থেকেই পুড়িয়ে রাখা — মানে লেজার রশ্মি দিয়ে লেখা হয় বলে এর চালু নামটা হল পোড়ানো বা বার্নিং। তথ্য এই মেশিনে ঢুকতে পারে অন্য মেশিন থেকেও, নেটওয়ার্ক মারফত। নেটওয়ার্ক-টা হতে পারে ল্যান বা লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক। হতে পারে ইন্টারনেট। কোনো একটা ওয়েবসাইটে গিয়ে একটা ওয়েবপেজে ক্লিক করলাম, পাতাটা আমার মেশিনে ঢুকে এল। এবার আমি ফাইলটাকে পড়তে পারি, তাকে রেখে দিতে পারি আমার ডিস্কে।

এই ফ্লপি বা হার্ড ডিস্ক বা সিডি আমার তথ্য রেখে দেওয়ারও মাধ্যম। যে ফাইল রেখে দিতে হবে তাকে সেভ করো ফ্লপি বা হার্ড ডিস্ক বা সিডিতে। শুধু রেখে দেওয়া কেন, আউটপুট বা তথ্য বার-করার মাধ্যমও হতে পারে এরা। এই যে জিএলটি ইশকুলের ক্লাসনোটসগুলো লিখে চলেছি, পর পর ফাইলে, ইশকুলের কেউ একটা চাইল, তাকে একটা ফ্লপি বা সিডিতে লিখে দিয়ে দিলাম ফাইলগুলো। সে আবার তার মেশিনে ওটা ঢুকিয়ে পড়ে ফেলতে পারবে।

আসলে আমরা কাজের ছকের ভিত্তিতে কম্পিউটারের অংশগুলোকে বুঝতে চাইছি। কাজের ভিত্তিতে যদি ভাগ করি, তাহলে কম্পিউটারের একটা কাজ হল তথ্য ঢোকানো। অনেক ভৌত উপাদানই আছে যা দিয়ে এটা করা যায়। কিন্তু তারা তখন প্রত্যেকেই কাজের নিরিখে এক — প্রত্যেকেই মেশিনে তথ্য ঢোকাচ্ছে। আবার ওই একই ভৌত উপাদানগুলো যখন অন্য কাজে লাগালাম, তথ্য তুলে রাখতে, কিম্বা বার-করতে, তখন তারা কাজের নিরিখে কম্পিউটারের অন্য রকমের একটা অংশ হয়ে গেল। তথ্য বার-করার, তথ্য তুলে-রাখার।

এবং একই ভৌত উপাদান নানা বিচিত্র ভাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। ধরুন যদি বলি, আপনার কম্পিউটারের হার্ড ডিস্ক — ওটার কাজ কী? সবাই একবাক্যে বলবে মূলত তথ্য তুলে রাখা, এবং প্রয়োজনমাফিক তথ্য ঢোকানো। কিন্তু, হুঁ হুঁ, আমি প্রবালকে দেখেছি, জিএলটি মধ্যমগ্রামের সভ্য, যে প্রায় পকেটে করে হার্ড ডিস্ক নিয়ে ঘোরে। এবং সঙ্গে তার কানেক্টর। আমি বলেছিলাম, তোর কাছে যে ডাউনলোড করা টেক্সটগুলো আছে, আমায় দিবি? বলল, ঠিক আছে, নেক্সট দিন তোমার জন্যে আমার বড় হার্ড ডিস্ক থেকে এই হার্ড ডিস্কটায় তুলে নিয়ে আসব।

এবং হার্ড ডিস্ক নিয়ে ঘোরা মানে বুঝতে পারছেন? আনতাবড়ি হিশেবে বলা যায় — ওর কুড়ি জিবির হার্ড ডিস্ক — মানে ধরুন মোটামুটি গোটা চল্লিশেক সিডি বা চোদ্দ হাজার ছশো তিরিশখানারও বেশি ফ্লপি। এতটা পরিমাণ তথ্য ফ্লপিতে নাড়াচাড়া করাটা একটা অসম্ভব ব্যাপার, তাই ফ্লপির কথা ছেড়েই দিন। সিডিতে করা যেত হয়ত, কিন্তু ওর কোনো সিডি বার্নার নেই, মানে সিডিতে লেখার ব্যবস্থা, বার্নার কেনার কোনো প্ল্যানও নেই — দিব্য চলে যাচ্ছে হার্ড ডিস্ক পকেটে ঘুরে। ওর নিজের মেশিনে কোনো নেট যোগাযোগও নেই, পাড়ায় সাইবার কাফেতে গিয়ে নেট করে। কথা বলে নিয়েছে, তাদের মেশিনে গিয়ে নিজের হার্ড ডিস্কটা লাগিয়ে নেয়, ব্রাউজ করে তুলে রাখে, পরে অপ্রয়োজনীয় অংশ ডিলিট করে, উড়িয়ে দেয়। প্রবাল আমায় যখন গল্পটা করছে আমি মনে মনে ভাবার চেষ্টা করছি সোদপুর এইচবি টাউনের সেই সাইবারকাফের মালিকের মুখটা — যখন তিনি প্রথমবার প্রস্তাবটা শুনলেন। এই গোটা প্রক্রিয়াটাই একান্তভাবে বিদঘুটে এবং বিপজ্জনক — এই প্রবাল-ব্র্যান্ড 'হাতে রইল হার্ড ডিস্ক' পদ্ধতি। হার্ড-ডিস্কটা যে কোনো মুহূর্তে নষ্ট হয়ে যেতে পারে, আর কোনো কম্পিউটারে গিয়ে তার ক্যাবিনেট খুলে সেটা লাগিয়ে নেওয়ার ঝঞ্ঝাট তো ছেড়েই দিন। এবং বেশির ভাগ লোক কম্পিউটারের ক্যাবিনেট খুলতে এত ভয় পায় যে আতঙ্কে হিম হয়ে যাবে এজাতীয় প্রস্তাবে। অর্থাৎ যে কোনো ভৌত উপাদানকেই, তার সম্ভাব্যতা অনুযায়ী, যে কোনো কাজের একক হিশেবে ব্যবহার করা যায়। করা হয় কি হয়না সেটা পরের প্রশ্ন — ভৌত উপাদানটার ভৌত ধর্মের প্রশ্ন।

মেশিনে তথ্য ঢোকানোর আর একটা বড় উপায় ইঁদুরের পেট টিপে কিঁচ কিঁচ মানে ক্লিক ক্লিক করতে থাকা। মাউস, বা মাউসের কোনো বিকল্প — মানে ট্র্যাকবল বা ওই জাতীয় কিছু। ধরুন আপনি এই যে ফাইলটা পড়ছেন, কোনো একটা ব্রাউজার মানে পরিদর্শক সফটওয়ার দিয়ে। যা দিয়ে আমরা ইন্টারনেটে বিভিন্ন ওয়েবপেজ চেখে বেড়াই, ইচ্ছে হলে নিজের মেশিনের ফাইল এবং ডিরেক্টরির সম্ভারগুলোও দেখতে পারি, সেই প্রায়োগিক সফটওয়ার বা অ্যাপ্লিকেশনকে বলে ব্রাউজার। এই ব্রাউজার দিয়ে আপনি সেই মেশিনের সেই ডিরেক্টরিটা খুললে ফাইলটা পেয়ে যাবেন, যেখানে ফাইলটা রাখা আছে। ব্রাউজার অনেক আছে, গ্নু-লিনাক্স হলে সচরাচর কংকোরার বা গ্যালিয়ন বা লিংক্স, আছে আরো অজস্র, আর উইনডোজ হলে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার বা নেটস্কেপ ন্যাভিগেটর। আমরা যখন তা দিয়ে কোনো মেশিনের কোনো একটা ডিরেক্টরি খুলি, সেখানে একটা বড় ছবি ফুটে ওঠে — তার মধ্যে পরপর সারি সারি ফাইলের ছবি — প্রত্যেকটার পাশে তার নিজের নাম। এই যে স্ক্রিনে এটা ফুটিয়ে তুলেছে কম্পিউটার — এটা কিন্তু তথ্য বার করা, বার করে সে স্ক্রিনের ছবিতে নিয়ে আসছে, তার নিজের উদরে অন্ত্র তন্ত্র কী আছে তার তালিকা, যাতে আপনি জানতে পারেন, তারপর ইচ্ছে বা প্রয়োজন মত তাদের নেড়ে চেড়ে দেখতে পারেন। ফাইলের ডিরেক্টরির তালিকা, মানে তথ্য। ছবিটাও তথ্য, অক্ষরে লেখা তালিকাটাও তথ্য। এবার সেই তালিকার মধ্যে যেই এই ফাইলের নাম লেখা ফাইলের ছবিতে আপনি আপনার মাউস নিয়ে গেলেন তখন কার্সর — মানে স্ক্রিনে মাউসের উপস্থিতির চিহ্নটা উত্থিত তর্জনীর মত বা ওইরকম কিছু হয়ে গেল। আপনি মাউসের বোতামটা টিপলেন : ক্লিক, ফাইলটা খুলে গেল। এই লেখাটা যদি আপনি নেট থেকে নামিয়ে থাকেন, তাহলে পাচ্ছেন একটা পিডিএফ ফাইলে। তাই, আপনি ফাইলটার উপর ক্লিক করা মাত্র, পিছনে, আপনার অগোচরে, মেশিন জাগিয়ে তুলল পিডিএফ ফাইল খোলার একটা সফটওয়ারকে, যে এবার ফাইলটাকে খুলে দেবে আপনার সামনে। পিডিএফ ফাইল পড়ার কোনো

একটা সফটওয়ার এই ফাইলের গোটা তথ্যটাকে, ছবি-তথ্যকে ছবি বানিয়ে, এবং অক্ষর-তথ্যকে অক্ষর বানিয়ে স্ক্রিনে ফুটিয়ে তুলল। বার করে আনল মেশিনে আবদ্ধ ফাইলের জঠর থেকে। এই ফাইলটাই খুলল কেন কম্পিউটার? কারণ, আপনি ক্লিক করেছিলেন এই ফাইলের ছবিতে। মানে এই ফাইলের ছবিতে ছবি-সুইচ নামক তথ্যের সঙ্গে সাঁটা ফাইল-নাম তথ্যটা কম্পিউটারকে পাঠিয়েছিলেন ফাইলটা খোলার নির্দেশ সহ। এই গোটাটাই তথ্য। যা আপনি পাঠালেন। মাউস ক্লিক করে।

মাউস ক্লিকটাও একটা খেলা, স্ক্রিনে ওই ছবির শরীরে কিছু কিছু জায়গা এমন করে তৈরি করা যেখানে মাউস নিলেই জায়গাটা অ্যাকটিভেটেড বা সক্রিয় হয়ে ওঠে, সেই সক্রিয়তা মানে, এবার মাউস-সুইচ ক্লিক করলেই ওই জায়গাটায় রাখা তথ্যটাকে মেশিনে পাঠিয়ে দেবে। মেশিন এবার এই ক্ষেত্রে দেখল যে সেটা একটা ফাইল নাম, এবং ওই ধরনের ফাইল কোন সফটওয়ার দিয়ে খুলবে সেটা মেশিনের আগে থেকেই জানা আছে, সেই সফটওয়ারকে জাগিয়ে তুলল মেশিন, সেই সফটওয়ার ওই তথ্যের মধ্যে পাওয়া নামের ফাইলটাকে খুলে আপনার সামনে হাজির করল। ধরুন বাজনা শোনার সফটওয়ার আলাদা, পিডিএফ ফাইল পড়ার সফটওয়ার আলাদা, এক ধরনের ফাইলকে অন্য ধরনের সফটওয়ার দিয়ে খুললে চলবেনা। মানে কম্পিউটার চলবে অবশ্যই, কিন্তু তাতে আপনার কাজ চলবে না। আপনি একটা ছবির ফাইলকেও টেক্সট বা লেখা হিশেবে খুলতে পারেন, স্ক্রিনে ফুটে উঠবে লাইন লাইন রাশি রাশি সংখ্যা চিহ্ন অক্ষর, তাতে আপনার ছবি দেখার নান্দনিক আগ্রহ কতটা পরিপূরিত হবে সেটা বলা কঠিন। আজকের দিনের শেষ দিকে আমরা এরকম একটা বিকট কাজ নিজেরাই করব।

মাউস।। একটা বহুল-ব্যবহৃত পয়েন্টিং ডিভাইস বা চিহ্নিত করার উপকরণ। প্রথম জনপ্রিয় হয় অ্যাপল কোম্পানির ম্যাকিনটোশ মেশিনের কল্যাণে। ক্রমশ যখন গুই বা গ্রাফিকাল ইউজার ইন্টারফেস, মানে কনসোলে টাইপ করে কমান্ড দেওয়ার বদলে ছবির মাধ্যমে কাজ করার পদ্ধতি, বাড়তে থাকে, ডস, উইনডোজ, অস/২ ইত্যাদি অপারেটিং সিস্টেমের সঙ্গেও ব্যবহার

হওয়া শুরু হয়। বিশেষত পার্সোনাল কম্পিউটার এবং ওয়ার্কস্টেশন মেশিনের দুনিয়ায়। মাউসের পুরো যন্ত্রপাতিটা ভরা থাকে একটা আবরণের মধ্যে যার তলার দিকটা সমতল, এবং উপর দিকটা হাতের তালু দিয়ে ধরার সুবিধের জন্যে তির্যক বর্তুল করে বানানো। উপরে দুটো বা তিনটে সুইচ, এবং এখন একটা চাকাও থাকে। এই সুইচ এবং চাকার যোগ থাকে নিচে একটা বলের সঙ্গে এবং সংযোগকারী তারের মাধ্যমে কম্পিউটারের সঙ্গে। মাউস নাড়ালে বলটা ঘোরে এবং তার সঙ্গে ঘোরে রোলার দুটো। ছবিতে দেখুন। রোলার দুটোর ঘোরা আসলে পরিমাপ করে কার্টেজিয়ান X অক্ষ এবং Y অক্ষ অনুযায়ী স্থান পরিবর্তনের হার, মানে মাউসটা অনুভূমিক এবং উল্লম্ব ভাবে কতটা নড়ছে — এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে নড়ে পর্দার উপরে মাউসের স্থান-চিহ্ন মানে কার্সরটা। সচরাচর এটা হয় তীর-আকৃতির। এই তীরটা ছবির উপর দিয়ে নড়তে থাকাকালীন ছবির বিশেষ বিশেষ কিছু জায়গা,

সেইভাবে ব্যবস্থা করা থাকে, সক্রিয় হয়ে ওঠে। আমরা দেখি সুইচের মত ব্যবহার করছে ছবির সেই অংশগুলো। তখন আমরা মাউসের সুইচ টিপি। একেই বলে ক্লিক করা। মাউসে যখন একটা চাকা থাকে — সেই চাকাটা স্ক্রোলিং বা পাতা ওঠানো নামানোর কাজ করে — চাকার নড়াটাকে সচরাচর ডাকা হয় Z অ্যাক্সিস ম্যাপিং বলে।

পয়েন্টিং ডিভাইস বলতে আমরা বুঝি যা দিয়ে পয়েন্ট করে, চিহ্নিত করে স্ক্রিনের পটে আঁকা ছবির নানা নির্দিষ্ট জায়গাকে, সেই জায়গায় নিহিত আদেশ চালু হয়ে ওঠে চিহ্নিত করার পরে ক্লিক করলেই। শুধু মাউস বা ট্র্যাকবল ধরনের কোনো পয়েন্টিং ডিভাইস না, হতে পারে এই গোছেরই অন্য কিছু — ট্র্যাকপ্যাড, জয়স্টিক — এরকম অনেক কিছুই। জয়স্টিক লাগে মূলত গেমস খেলার জন্যে — আমাদের কলকাতা লাগ-এর গেমস-বিশেষজ্ঞ তথাগত এ বিষয়ে আপনাদের জানাতে পারবে — লাগে লিখবেন। অজস্র কোম্পানি অজস্র সিস্টেমে অজস্র রকমে এই কাজটা করার চেষ্টা করেছে — তার প্রমাণ পাবেন নেটে। যদি সেই পয়সা থাকে, একদিন নেটে গিয়ে মোট সম্ভাব্য পয়েন্টিং ডিভাইস গোনার চেষ্টা করতে পারেন, মায়াপ্রপঞ্চময় এই ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ বুঝে যাবেন।

কম্পিউটারে তথ্য ঢোকার আরো আরো উপায় হতে পারে স্ক্যানার — বাস্তব ছবিকে কাগজ বা পট থেকে কম্পিউটারে ব্যবহারযোগ্য গ্রাফিক্স তথ্যের ফাইলে বদলে নিলেন, এবার কম্পিউটার স্ক্রিনেই ছবিটাকে নাড়াঘাঁটা করতে পারবেন — মানে ওই গ্রাফিক্স তথ্যটা মেশিনে ঢোকালো স্ক্যানার। হতে পারে ডিজিটাল ক্যামেরা — গ্রাফিক্স তথ্যকে ফিল্ম প্রিন্ট হওয়ার যন্ত্রে না-পাঠিয়ে পাঠাচ্ছে কম্পিউটারে। মাইক্রোফোন — আপনার অবিস্মরণীয় কণ্ঠস্বর থেকে আপনার পরের প্রজন্ম যাতে বঞ্চিত না-হয়, আপনি তাই সেটা অডিয়ো মানে শব্দসংক্রান্ত তথ্য করে পাঠিয়ে দিলেন মেশিনে এই মাইক্রোফোন দিয়ে। ভিডিও-ক্যাসেট রেকর্ডার এবং তার থেকে কম্পিউটার তথ্যে রূপান্তরিত করার কার্ড (কার্ড কাকে বলে এই জ্ঞান আপনি অচিরেই পাবেন) — সমভিব্যাহারে এরা দুজনেও তথ্য ইনপুট করে কম্পিউটারে। ভিডিওক্যাসেট থেকে কম্পিউটারে দেখনযোগ্য ফাইল বানায়।

০.৩।। আউটপুট বা কম্পিউটার থেকে তথ্য-বেরোনো

কম্পিউটার থেকে তথ্য বেরোনোর সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান উপায় হল স্ক্রিন মানে পিসির কনসোল। যা চাও তাই ফুটিয়ে তুলবে — অক্ষর বলো অক্ষর, ছবি বলো ছবি, আলোহীন অন্ধকার চাইলে তাও — যদি মেশিন বা কনসোল অফ করে দাও। আমার পারিবারিক অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, এই তৃতীয়টাও মাঝে মাঝে বেশ জনপ্রিয় প্রকার হয়ে ওঠে বৈকি।

তথ্য বার করার আর একটা জনপ্রিয় উপায় হল প্রিন্টার। কম্পিউটারের ইতিহাসের, এই পাঠমালার তিন আর চার নম্বর দিনে বিশদ ভাবে দেখব আমরা, একদম প্রথম দিকে এই তথ্য বার-করার প্রায় গোটাটাই ছিল কাগজে ছেপে। আজকের দুনিয়ায় যদিও, গোটা সাইবারতথ্যের একটা খুব ছোট ভগ্নাংশই শেষ অব্দি ছাপা হয়। এটা আমার বন্ধুদের অনেককেই আমি বোঝাতে পারিনা — স্ক্রিনে পড়া অভ্যেস করো। তাদের সব ঝিনচাক প্রিন্টার, আমার মত মজদুর-ব্র্যান্ড ডট-ম্যাট্রিক্স নয়, যা খুশি যখন খুশি ছেপে নেয়, দু চারটে আমাকেও দেয় বটে।

আইসি বা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট।। একটা আইসি বা ইন্টিগ্রেটেড-সার্কিট-এ থাকে বৈদ্যুতিন বা ইলেকট্রনিক যোগাযোগে পরস্পর যুক্ত মানে সার্কিটাবদ্ধ একাধিক ট্রানজিস্টর এবং রেজিস্টর — এই সার্কিটসহ এদের গোটাটাকে একটা বিশেষ প্রযুক্তি দিয়ে
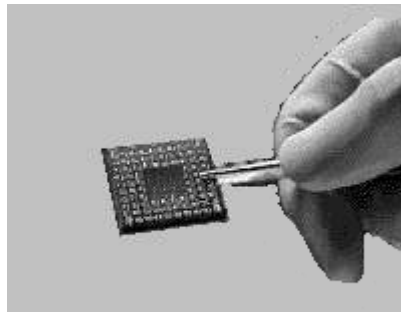
আইসি বা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট

দেগে দেওয়া হয়, গেঁথে দেওয়া হয় একটা ছোট্ট সিলিকন ক্রিস্টালের চিপে। এবং সচরাচর এই ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটগুলোকে

একটা থেকে অন্যটাকে আলাদা করা হয় এদের মধ্যে কতগুলো ওই ট্রানজিস্টর বা রেজিস্টর ইত্যাদি উপাদান রইল — তার ভিত্তিতে। কম্পিউটারের সিপিইউ-ও এইরকম একটা একক চিপ। দশ লক্ষেরও বেশি ট্রানজিস্টর সম্পন্ন এই ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটটাকে দেগে দেওয়া হয় একটা মোটামুটি ভাবে এক বর্গইঞ্চির সিলিকন চিপে। এখন যদিও একাধিক চিপের কম্পিউটারও হচ্ছে — এদের ডাকা হয় সিমেট্রিক-মাল্টি-প্রসেসিং মেশিন বলে, আমি নিজে এখনো শুধু এই এক চিপের মেশিনই চোখে দেখেছি। আমার পরিচিত পরিজনদেরও কারুর নেই। থাকলে দেখে আসতাম। এক চিপের সিপিইউ সবচেয়ে জনপ্রিয় যেগুলো — পেন্টিয়াম সিরিজ, অ্যাথলন, সাইরিক্স ইত্যাদি।

একটা জিনিষ খেয়াল করুন — কম্পিউটার তার প্রিন্টারে যা পাঠাচ্ছে সেই বারমুখো তথ্য — তা কিন্তু নিছক অক্ষর না, আরো বহু বহু কিছু। ধরুন এই লেখাটার এই বাক্যটাকেই। এটা পড়ছেন ১৪ পয়েন্ট অক্ষরে, ১১ পয়েন্টে নয়, ৯ পয়েন্টে নয়, **১৮-ও নয়,** সরল সাদামাঠা ১৪ পয়েন্টে। লেখাটার একদম প্রথম পাতার ব্রহ্মতালুতে দেখুন 'গ্নু-লিনাক্স ইশকুল' বাঁদিক ঘেঁষে, তার পরের প্যারাটাই ডানদিক, তার পরেরটা একদম মাঝামাঝি। এইসব কায়দাবাজি ছাড়াও ছবি আছে অনেক। অক্ষর ছাড়াও এই সমস্ত তথ্যই কম্পিউটার পাঠাচ্ছে তার স্ক্রিনে বা প্রিন্টারকে। কী ছাপবে, কী করে ছাপবে, তার সব ডিটেইলস। এই ফাইলটাকে যদি নিছক টেক্সট আকারে খোলেন, তারও উপায় আছে, দেখবেন। একটা লেখার ফাইলের এই গোটা তথ্যটার খুব সামান্য অংশই অক্ষর।

মাদারবোর্ড।। কম্পিউটারের হৃদপিণ্ড। মূল সার্কিট বোর্ড — যার গায়ে লাগানো থাকে কম্পিউটারের জরুরি সমস্ত উপাদান।
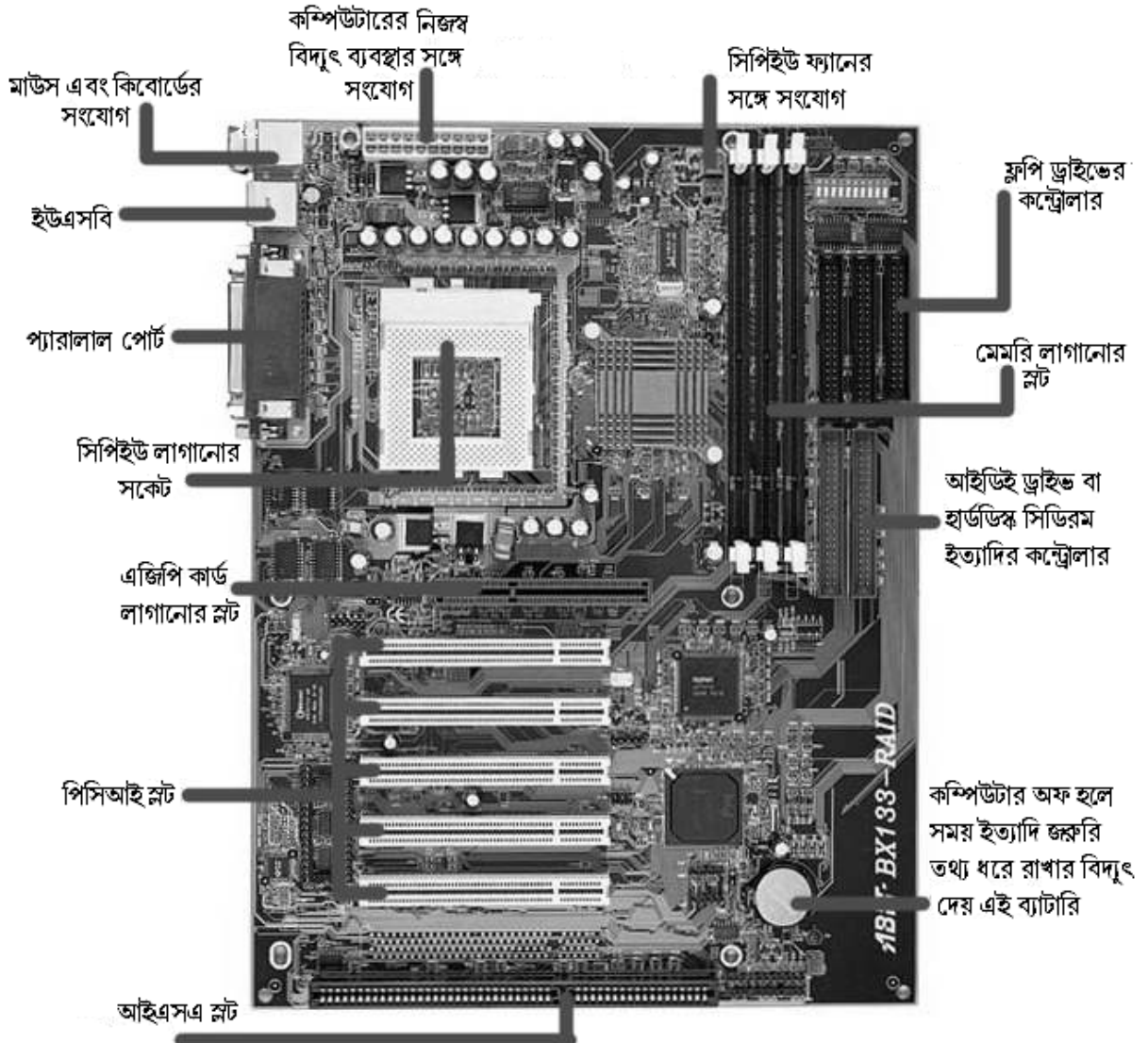
এই বোর্ডেই বসবাস করে সিপিইউ, মূল মেমরি, এদের তথ্য চলাচলের সার্কিট সংযোগ, বাস কন্ট্রোলার (সেটা কী বস্তু তা

বুঝতে আমাদের কিঞ্চিত বিলম্ব হবে, পাঠমালার দু নম্বর দিনের শেষ অব্দি) এবং কানেক্টরগুলো — যারা এই বিভিন্ন উপাদানগুলোর মধ্যে বৈদ্যুতিক এবং তথ্যের সংযোগ ঘটায়। অন্য আর সমস্ত বোর্ড, মানে এক্সটেন্ডার বোর্ড, অ্যাডাপ্টার কার্ড, পরিবর্দ্ধিত মেমরি, ভিডিওকার্ড ইত্যাদি অন্যান্য ইনপুট-আউটপুট কার্ড — এ সমস্তই লাগানো হয় এই মাদারবোর্ডের গায়ে। বাস কানেক্টর এদের মধ্যে তথ্য সংযোগ ঘটায়। এখানে আমরা একটা মাদারবোর্ডের ছবি দিলাম, এটা নেট থেকে পাওয়া, কারণ, অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই একটা ডিজিটাল ক্যামেরা যোগাড় করতে পারিনি, যা দিয়ে এই লেখা যে মেশিনে চলছে সেই মেশিনের অংশগুলোকে দেখানোর প্ল্যানটা কাজে আনা যেত। শুধু মধ্যে বাংলা লিখে এর কপিরাইটের সঙ্গে খুনশুটি করা হল। এখানে দেখুন অনেকগুলো অংশ আপনি এই মুহূর্তে বুঝতে পারবেন না অনেকেই। গোটা পাঠমালাটা পড়া হতে আর একটু পারবেন, তা নিয়ে চিন্তিত হবেন না। নিজের মেশিন একবার খুলে দেখে ফেলুন, সেটা বেশ উপকার করে। পিউ এবং অশেষ এই দুজনের সঙ্গেই এভাবে শুরু করেছিলাম, মেশিনটা খুলে ফ্যাল, দ্যাখ, কী কী চিনতে বা বুঝতে পারছিস। যদি গন্ডগোল হয়, হার্ডওয়ারের লোক ডাকতে হবে, সে তো এমনিতেও মাঝে সাঝেই হয়। তাকে আসল গল্পটা বলতেই হবে, এর কী মানে আছে? প্রকৃত বিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্বকর্মাকে একবার স্মরণ করে নিলে আর পাপ হবেনা।

এই ফাইলটা লেখা হচ্ছে আমার পিসিতে। আমার মেশিন সেটা মোডেম মারফত নেটে পাঠাচ্ছে — মানে আউটপুট-টা হচ্ছে অন্য কম্পিউটারে। তারপর সেই কম্পিউটার থেকে আবার নেট মারফত ইনপুট হচ্ছে আপনার পিসিতে। অথবা প্রথমে ফ্লপি বা সিডিতে বার করা হচ্ছে — সেই আউটপুটটা ফ্লপি বা সিডি মারফত পৌঁছে যাচ্ছে আপনার মেশিনে। এই নেট বা ফ্লপি বা সিডিটা, বা প্রবালের হার্ডডিস্কও — এখানে তথ্য বার করার উপায়।

ফ্লপি ডিস্ক এবং ফ্লপি ডিস্ক ড্রাইভ।। তথ্য ঢোকানো এবং বার করার একটা জনপ্রিয় কিন্তু অনিশ্চিত উপায়। বাঁদিকে একটা ফ্লপি
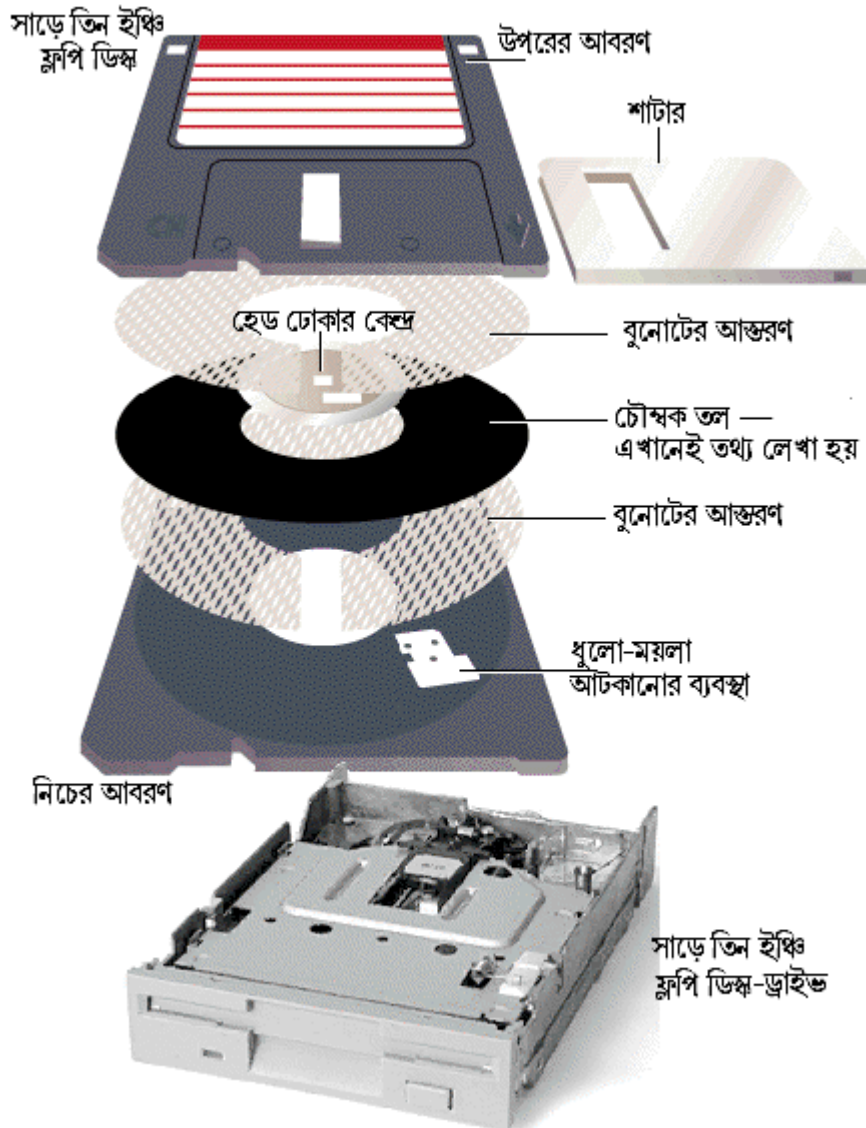
ডিস্কের ভিতরের উপাদানগুলো দেখানো হল। ফ্লপি হল তথ্য ঢোকানো এবং বার-করার, ইনপুট-আউটপুটের একটা বিদ্যুত-চুম্বকীয় মাধ্যম। একটা মোটর ফ্লপি ডিস্কটাকে ঘোরায়। আর একটা মোটর এক বা একাধিক রিড-রাইট হেড বা তথ্য লেখা-পড়ার ছুঁচকে ওই তথ্য লেখার চৌম্বক আস্তরণের তলের উপর দিয়ে নড়ায়। এই তথ্য যাতায়াত করে কম্পিউটার থেকে ফ্লপিতে যখন ফাইল লেখা হচ্ছে, আর ফ্লপি থেকে কম্পিউটারে, যখন ফাইল পড়া হচ্ছে। আগে ৫.২৫ ইঞ্চির ফ্লপিও হত, আমরা এখানে ৩.৫ ইঞ্চির ফ্লপি দেখিয়েছি। এত খারাপ হয় যে ফ্লপি ব্যবহার করার প্ল্যান থাকলে কোনো ফ্লপি-কোম্পানির কর্মচারীর সঙ্গে হটলাইন বানানোর তাল করা উচিত।

গান না-চালিয়ে লিখতে বা পড়তে পারিনা — সেই গানটা চলছে সাউন্ডবক্সে — অডিয়ো তথ্য বেরিয়ে আসছে। এই দিলীপ রায়ের গানগুলো ক্যাসেট থেকে আমার জন্যে এমপিথ্রি মানে কম্পিউটার-ব্যবহারযোগ্য ফাইল বানিয়ে দিয়েছে অশোকদা। সেখানে ইনপুট হয়েছিল বাস্তব কাঁচা র অডিও, অশোকদা সেটাকে টিমিডিটি বলে একটা সফটওয়ার দিয়ে এমপিথ্রি করে সেই ফাইল সিডিতে করে বার করে এনে আমায় দিয়েছিল। আমার মেশিনে ঢুকে সে আবার সাউন্ডবক্স দিয়ে আউটপুট হচ্ছে। ওই সিডিটা ছিল রিরাইটেবল, বারবার একই জায়গায় পুরোনো তথ্য উড়িয়ে নতুন তথ্য পুড়িয়ে দেওয়া যায়। আউটপুট ডিভাইস।

একটা জিনিষ ফের একবার মনে রাখুন, এই বার-হওয়া তথ্য বা আউটপুটটা কিন্তু গোটাটাই হল পরপর অগণ্য ০ এবং ১-এর একটা প্রবাহ, বাস্তব দিলীপ রায়ের বাস্তব গলার দার্ঢ্যটাও কিছু সবিশেষ ০ এবং সবিশেষ ১, যা ধরুন সুনিধি চৌহানের গলার তীব্র তীক্ষ্ণতার নিজস্ব ০ আর ১-এর প্রবাহের বিশেষতা থেকে আলাদা। অশোকদার ব্যবহৃত টিমিডিটি নামক সফটওয়ার ওই শব্দতরঙ্গের ওঠানামার বাস্তবতাটাকে বদলে দেয় সারি সারি শব্দরূপান্তরযোগ্য ০ এবং ১-এর বাস্তবতায়। আমরা পরে ফের আসব এটায়। দিন এক, দুই এবং পাঁচ-এ, বিশেষ করে।

সার্কিট বোর্ড।। এপক্সি বা ফেনলিক রেজিন জাতীয় কোনো তড়িৎ-অপরিবাহী জিনিষের চৌকো সমতল টুকরো — যার উপরে ইলেকট্রনিক ছোটছোট উপাদানগুলো লাগিয়ে দেওয়া হয়, বৈদ্যুতিক যোগাযোগ সহ। এখনকার প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ডে তামার
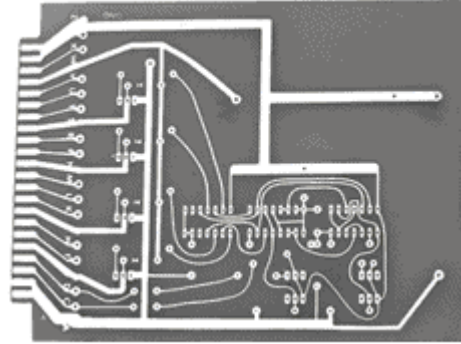
পাতে তৈরি সংযোগগুলো আগে থেকেই ছাপানো থাকে — ফোটোলিথোগ্রাফি করে। বোর্ডের একদিকে বা দুদিকেই থাকতে পারে বৈদ্যুতিন উপাদানগুলো। খুব জটিল সার্কিট বোর্ডে এই উপাদান এবং যোগাযোগগুলো তৈরি করা থাকে একাধিক স্তরে।

০.৪ ।। ইনফর্মেশন প্রসেসিং বা তথ্য চটকানো

এই তথ্য চটকানোর প্রায় গোটা কাজটাই করে আলু (ALU — **A**rithmetic-and-**L**ogical-**U**nit)। আলু ফলে থাকে সিপিইউ (CPU — **C**entral-**P**rocessing-**U**nit) — মানে আমরা যাকে প্রসেসর বলে উল্লেখ করেছি আমাদের ছবিতে — তারই একটা অংশে। আলু যোগ বিয়োগ গুণ ও ভাগ করে, এবং দুটো সংখ্যাকে তার সামনে ধরে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতে পারে — এর মধ্যে কোনটা বড় — আলুর কী আশ্চর্য বুদ্ধি বলুন তো। এক কথায়, কম্পিউটারের সমস্ত লজিকাল অপারেশন বা যৌক্তিক হিশেব করে এই আলু। গ্নু-লিনাক্স ইশকুলের এই পাঠ পড়তে পড়তে আমরা প্রসেসর বিষয়ে আরো অনেক কিছুই জানতে পারব।

শুধু একটা জায়গা খেয়াল করুন — এটাকে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বলে ডাকছি। তার মানে, কিছু অসেন্ট্রাল চিপও আছে নিশ্চয়ই। একটা কম্পিউটারের মাদারবোর্ডে (মানে এই চিপ মেমরি সার্কিট — এই সবকিছুর থাকা এবং খেলা

করার জন্যে একটা মায়ের কোল) থাকে একগুচ্ছ চিপ, কম করে গোটাপাঁচেক তো বটেই। তার এক একটার এক এক জাতের কাজ। কিন্তু তারা হল নামহীন নির্বাক কর্মচারীর মত, তাজমহলকে লোকে শাজাহানের নামেই চেনে, আপনার মেশিনকে আপনি ডাকেন পেন্টিয়াম ওয়ান টু থ্রি বা ফোর বলে, অ্যাথলন বা ডিউরন বলে, আগে ডাকতেন ৪৮৬ বা ৩৮৬ বলে — সেটা হল ওই কেন্দ্রীয় বা সেন্ট্রাল প্রসেসরের নামে। কারণ, এই প্রসেসরটা কী তার উপরেই মূলত নির্ভর করে অন্য চিপগুলো কী হতে পারে। শুধু অন্য চিপগুলোই নয়, অন্যান্য অংশগুলোও কী বা কী কী হতে পারে — তাও প্রায় ঠিক হয়ে যায় এই সিপিইউ ঠিক হয়ে যাওয়া মাত্রই। এই অন্যান্য চিপগুলোর বিষয়ে উল্লেখের বাইরে খুব বেশি কিছু আলোচনা আমাদের এই গ্নু-লিনাক্স ইশকুলের পাঠমালার এক্তিয়ারের বাইরে থাকবে।

০.৫।। ইনফর্মেশন হোল্ডিং বা তথ্য ধরে রাখা

দীর্ঘ সময়ের জন্যেই হোক, বা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, কম্পিউটারকে তথ্য ধরে রাখতেই হবে। পরিমাণটা খুব সামান্যও হতে পারে, আবার ডেটাবেস সার্ভারের মত বীভৎস বিপুলায়তনও হতে পারে। ধরুন যে তথ্যটুকুকে সে প্রসেস করছে, আমাদের ভাষায় চটকাচ্ছে, চটকানোর সময়টুকু অন্তত তথ্যটা তার হাতের তালুর মধ্যে থাকতে হবে — নইলে চটকাবে কী করে? এবং প্রতিটি চটকানোই অন্য প্রত্যেকটার থেকে আলাদা। কখনো ময়দাটাকে চটকাতে হবে ময়ান দিয়ে গরম জল দিয়ে, পরোটা বা লুচি হবে, কখনো ময়দা চটকাতে হবে টক দই দিয়ে, যদি ছোলে-বাটুরে বা রাধাবল্লভী হয়, আবার নানখাটাই হলে চটকাতে হবে চিনি আর সাদা তেল দিয়ে। আর কম্পিউটারের ময়দা তো শুধু একটা মাত্র রকমের নয়, হরেক আলাদা আলাদা কাজের আলাদা আলাদা সফটওয়ারের চাই আলাদা আলাদা ডো। চটকানোর জন্যে প্রয়োজনীয় সময়টুকু ধরে এই গোটা পদ্ধতি, উপকরণ — গোটাটাই ভরা থাকা চাই কম্পিউটারের মুন্ডুর ভিতর। (এই ডো ভরে রাখার জন্যে কম্পিউটারের নানা ধরনের মুন্ডু আছে। সেই আলোচনায় আমরা আসছি ঠিক এক প্যারাগ্রাফ বাদেই।)

এক্সটেন্ডার বোর্ড।। সেই সমস্ত সার্কিট বোর্ড যাদের গুঁজে দেওয়া হয় মাদারবোর্ডে, কম্পিউটারের বাসে সংযুক্ত হয়ে এরা সেই কাজ করার সুযোগ দেয় শুধু মাদারবোর্ডে যা করা যেত না। এই এক্সটেন্ডার বা এক্সপ্যানশন বোর্ড দিয়ে মেমরি যোগ করা হয়,
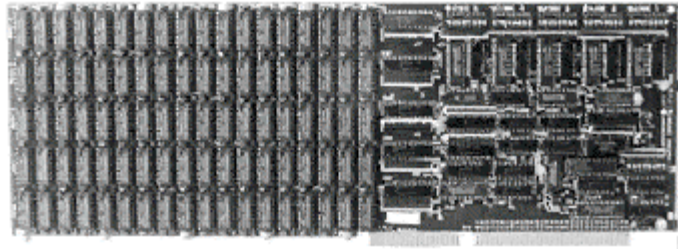
এক্সপ্যানশন বোর্ড

এক্সপ্যানশন স্লট (মাদারবোর্ডের শরীরে)
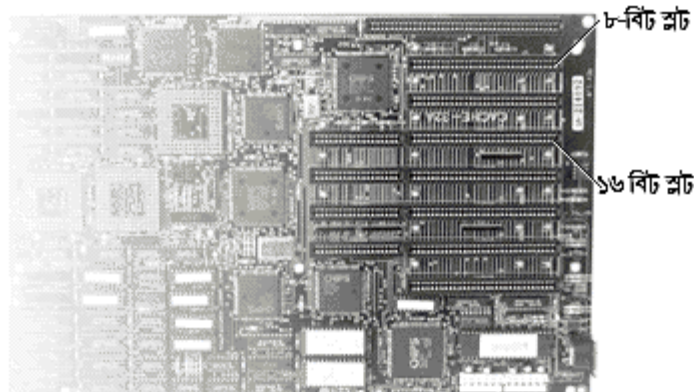
ডিস্ক ড্রাইভ কন্ট্রোলার লাগানো হয়, ভিডিও সাপোর্টকে উন্নততর করা হয়, প্যারালাল এবং সিরিয়াল পোর্ট যোগ করা হয়, এবং ইন্টারনাল মোডেম লাগানো হয়। মাদারবোর্ডে এক্সপ্যানশন বোর্ড লাগানোর জন্যে স্লট বা খাঁজ বানানো থাকে — ৮ বা ১৬ বিট স্লট (পরে বুঝব) এদের বলে এক্সপ্যানশন স্লট। এখানে যে এক্সপ্যানশন স্লট বা অ্যাডাপ্টার কার্ড আমরা দেখালাম, সেগুলো সবই বেশ পুরোনো আমলের, তার কারণটা তো আগেই বলেছি, কিন্তু তাতে খুব একটা কিছু এসে যাবে বলে মনে হয়না। মূল গঠনের বিশেষত্বটাই খেয়াল করার। এর সঙ্গে নিজের মেশিন খুলে মিলিয়ে নিলেই গোটা ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে বলে মনে হয়।
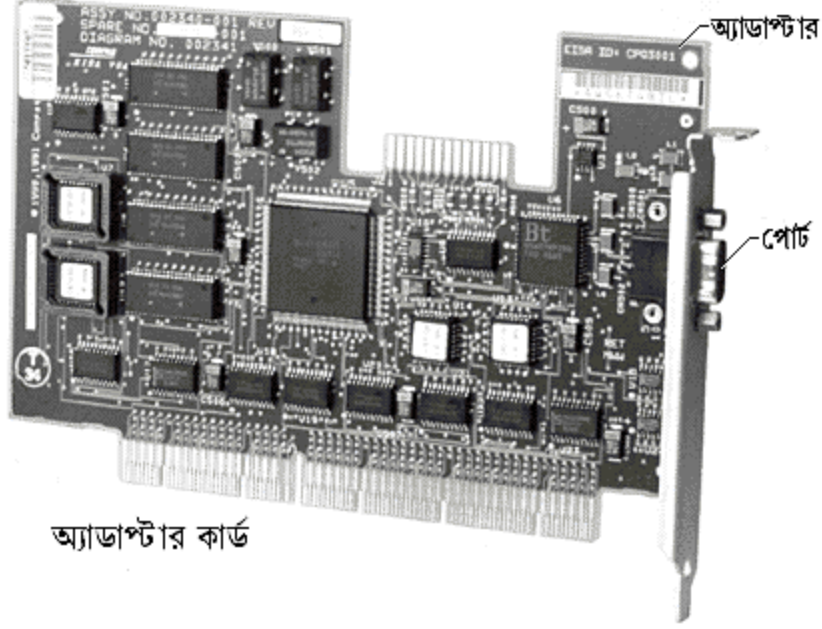
অ্যাডাপ্টার কার্ড।। অ্যাডাপ্টার বলতে বোঝায় একটা প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড যা দিয়ে একটা কম্পিউটারে সেইসব পেরিফেরাল উপাদানকে লাগানো হয়, যেমন সিডিরম ড্রাইভ, মোডেম, জয়স্টিক ইত্যাদি — যেগুলোর জন্যে সরাসরি তার দিয়ে বা পোর্ট দিয়ে বা প্রিন্টেড বোর্ড দিয়ে কোনো সংযোগ প্রাথমিক ভাবে কম্পিউটারে করা থাকেনা। একটা অ্যাডাপ্টার কার্ডে একের বেশি অ্যাডাপ্টার লাগানো থাকতে পারে।

অর্থাৎ দু-ধরণের ইনফর্মেশনকেনাড়াচড়া করতে হয় আপনার মেশিনের। একটা হল কী চটকাব। অন্যটা হল কী ভাবে চটকাব। একটাকে বলা যায় ডেটা বা তথ্য। অন্যটা হল ইন্স্ট্রাকশন বা কমান্ড বা আদেশ। এই তথ্য এবং নির্দেশ দুটোই কিন্তু তথ্য — এই অর্থে যে মেশিনের কাছে দুটোই হল শূন্য আর এক-এর সমাহার। অজস্র অগণ্য ০ আর ১। তাই একই ধরনের তথ্য-ধারণ উপাদান দুটোকেই ধরে রাখতে পারে। একই স্মৃতি-কোষ বা মেমরি একই ভাবে নাড়াচাড়া করে দুটোকেই। হার্ড ডিস্কে দুটো ধরনের ফাইলই একই সঙ্গে থাকে। কিছু ফাইল প্রোগ্রাম ফাইল বা বাইনারি ফাইল বা এক্সিকিউটেবল ফাইল — মানে প্রোগ্রাম — চালানো হলে যারা চলে। আর অন্য ধরনের ফাইল হল তারা যাদের উপর এরা চলে। ধরুন একটা ওয়ার্ড প্রসেসর — মানে যা দিয়ে আপনি লেখেন। সেটা এমএস-ওয়ার্ড হোক বা ওপন-অফিস-অর্গ বা লোটাস স্মার্টস্যুট রাইটার — এরা প্রত্যেকেই এক একটা প্রোগ্রাম ফাইল। যারা চলে। আর আপনার লেখাটা যে ফাইলে রয়েছে সেটা হল সেই ফাইল যাদের উপর এরা চলে। প্রোগ্রাম ফাইলগুলো হল ইন্স্ট্রাকশন — কী ভাবে চটকানো হবে। আর ওই ডেটা বা তথ্য ভরা লেখার ফাইলটা হল তাই যাকে চটকানো হয়। এবার যাওয়া যাক ওই বিভিন্ন ধরনের তথ্য ধারণের মুন্ডুর আলোচনায়। পরপর তিনটে ছোট ছোট সাবসেকশনে।

তিন ধরনের স্মৃতিধারণোক্ষম মুন্ডুর প্রথমটাকে বলা যায় ক্ষণস্থায়ী মুন্ডু — ঠিক ততটুকু সময়ই ধরে রাখে যতটুকু সময় ধরে তথ্য এবং আদেশ চটকায়। যে মুহূর্তে চটকানো শেষ হয় এই স্মৃতিটা উবে যায়। এর নাম র‍্যাম (RAM — **R**andom-**A**ccess-**M**emory)। অন্য মুন্ডুটায় স্মৃতি হল স্থায়ী। গোটা মুন্ডুটাকে না-বদলে স্মৃতির কোনো অংশকে বদলানো সম্ভব না। একে বলে রম (ROM — **R**ead-**O**nly-**M**emory)। অন্য আর এক ধরনের মুন্ডু হল আপনার

ইচ্ছানির্ভর। যেমন আপনার মেশিনের হার্ডডিস্ক। যখন আপনার নিজের কম্পিউটারের হার্ডডিস্কটাকে মেদুর স্মৃতিভারাতুর বলে হবে তখন আপনি ঘচাঘচ করে ফাইল ওড়াতে থাকবেন। এবং, এটা অবশ্যম্ভাবী, ফাইল ওড়ানো মাত্রই আপনার মনে হবে — এমা, কী করলাম, এটা তো সাঙঘাতিক কাজের ফাইল। চন্দ্রিল বলেছিল ফিল্ম বানানোর একটা ল — দি ল অফ দি লিস্ট পসিবল ক্যালামিটি। যে কেলোটা ঘটার মিনিমাম চান্সও নেই সেটাও ঠিক ঘটবেই শুটিং-এর দিন সকালে, ঠিক সেইরকম, সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ফাইলটাকে আপনি একবার না একবার ভুল করে ওড়াবেনই ওড়াবেন। এই জন্যেই ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বারম্বার লিপিবদ্ধ আছে নিয়মিত হার্ডডিস্ক ব্যাকআপের প্রয়োজনীয়তার কথা। যাকগে শাস্ত্রে যখন আছে আমরা আর বলে কী করব?

০.৫.১।। অনুদ্বায়ী বা স্থায়ী স্মৃতি — রম

আগেই বললাম, এই স্মৃতিটা কাজ শেষ হওয়ামাত্রই কর্পূরের মত উবে যায়না। একটু আগে আমরা কম্পিউটারের সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটের মূল চিপ এবং অন্যান্য আরো যে চিপগুলোর কথা বলছিলাম — এরা এই ধরনের স্মৃতির একটা আধার। যেমন ধরুন বায়োস (BIOS — **B**asic-**I**nput/**O**utput-**S**ystem)। এই পাঠমালার পাঁচ নম্বর দিনে, এবং পরেও, আমরা একটা কম্পিউটার চালু হয়ে ওঠার গোটা প্রক্রিয়াটা অনেক খুঁটিয়ে আলোচনা করেছি — যার অন্য নাম বুট। এখন জাস্ট এইটুকু জানুন যে কম্পিউটারে যখন প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়, বিদ্যুতযোগাযোগ চালু করার পর যখন ধীরে ধীরে স্ক্রিনে ফুটে ওঠে ছবি বা লেখা, কম্পিউটার ক্রমে আপনার আদেশ নেওয়ার এবং সেই আদেশ অনুযায়ী কাজ করার জায়গায় পৌঁছয় — সেই সময়টা জুড়ে অজস্র কিছু ঘটতে থাকে মেশিনের ভিতর। যার কিছুই প্রায় বাইরে থেকে আন্দাজ করা যায়না।

কিন্তু সব স্মৃতিই যদি কারেন্ট অফ করে দেওয়া মাত্র উবে যেত তাহলে প্রত্যেকবার নতুন করে কম্পিউটারকে ইনস্টল করতে হত, সমস্ত কাজের প্রোগ্রাম নতুন করে ভরতে হত কম্পিউটারে, বা কম্পিউটার কখনো অফ করা যেত না। তা যখন হয়না, তখন নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় কিছু কিছু জিনিষ রয়ে যায় কম্পিউটারে। হার্ডডিস্কের ফাইলগুলো তো রয়ে যায়ই, মাদারবোর্ডের রমচিপগুলোয় রয়ে যায় আরো কিছু তথ্য বা আদেশ যারা কম্পিউটারকে অন হওয়ার পর থেকে কাজ করার জায়গা অব্দি পৌঁছে দেয় — হার্ডডিস্কের ফাইলগুলো নাড়াচাড়া করার জায়গা অব্দি। এই অব্দি কম্পিউটার ঠিক কী কী করবে, কোন পথে এগোবে সেটা ভরা থাকে এই এই বায়োস-এ। এই বায়োসটা থাকে মাদারবোর্ডের একটা চিপে — যার নাম বায়োস চিপ। সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটের পাশাপাশি অন্যান্য অপ্রধান চিপগুলোর একটা। আর সিপিইউতে দেখানো থাকে এই বায়োস-রম-চিপের ঠিকানা। যাতে বুট করার সময় কম্পিউটার এই বায়োস চিপ থেকে পড়া শুরু করতে পারে।

এই বায়োস রম চিপে সেইটুকু ন্যূনতম নির্দেশ ভরা থাকে যা বিদ্যুত না-থাকা-কালীনও কম্পিউটার থেকে মুছে যাবেনা, যা থেকে কম্পিউটার জানতে পারবে বুটকালীন তাকে কী কী করতে হবে। এছাড়া অন্য আর যেসব রম থাকে কম্পিউটারে — তার মধ্যে পড়ে — প্রথমেই কোন কোন হার্ডওয়ার পার্টসকে, ভৌত যন্ত্রাংশকে সক্রিয় করে তুলতে হবে তার তালিকা। এই ধরনের রম চিপের কোনোটায় ভরা থাকে নির্মাতা এবং মডেলের খুঁটিনাটি — যা থেকে ঠিক বুট করার সময়েই কম্পিউটারের স্ক্রিনে এগুলো ফুটে ওঠে। এই রম-চিপগুলোয় অনেকক্ষেত্রে আবার প্রয়োজন পড়লে লিখে রাখা নির্দেশগুলো বদলে ফেলা যায়। তবে এই প্রক্রিয়াটা সবসময়ে খুব সহজসাধ্য নয়। যেমন বায়োস নির্দেশকে বদলানো — যার টেকনিকাল নাম বায়োস ফ্ল্যাশিং। যাকগে, এগুলো আমাদের পাঠমালার আলোচ্য বিষয় নয়।

০.৫.২।। উদ্বায়ী স্মৃতি — র‍্যাম

এই দ্বিতীয় ধরনের মুন্ডুতে কম্পিউটার তার স্মৃতিকে রাখে অস্থায়ী রকমে। পুনর্নবীকরণযোগ্য ডিসপোজেবল স্মৃতি ভরে রাখার মুন্ডু বলে ডাকা যায় র‍্যামকে। মেশিনে বিদ্যুত অফ হল তো এই স্মৃতিও হাফিজ হয়ে গেল। বা কম্পিউটার রিস্টার্ট করলেও। একধরনের ইলেকট্রনিক চিপ যাতে তথ্য লেখা এবং পড়া যায়। যেহেতু কম্পিউটার খুব সহজেই খুব দ্রুত এই চিপের যে কোনো জায়গায় লিখতে পারে বা যে কোনো তথ্য পড়ে ফেলতে পারে, বা

এখানে নতুন তথ্য লিখে নিতে পারে পরে পড়বে বলে, মানে এলোপাথাড়ি ভাবেই সক্রিয় করে তুলতে পারে এর যে কোনো অংশকে — তাই একে র‍্যানডম অ্যাকসেস মেমরি বলে।

পিসির মাদারবোর্ডে র‍্যামচিপ লাগানোর জন্যে বিশেষ খাপ বা স্লট থাকে। সেই দুপাশে ক্লিপ লাগানো খাপের ভিতর র‍্যাম চিপের কার্ডটাকে লাগিয়ে দেওয়া হয়। একটা কার্ডে একগুচ্ছ করে র‍্যামচিপ থাকে। অনেকগুলো করে র‍্যামচিপ

লাগানো এই কার্ডগুলোকে ডাকা হয় মেমরি মডিউল বলে। মেমরি মডিউল অনেক রকমের হয়। তবে একটার জায়গায় অন্যটা লাগানো যায়না। মেমরি বাড়ানোর প্ল্যান থাকলে এইটা ভেবে কিনতে হয়। একই রকমের মডিউলের ভিতরেও আবার নানা ধরনের ব্যাপার আছে। তার অনেকগুলো বেশ ঝঞ্ঝাটের। সচরাচর চারদিকে যেরকম সব উইনডোবাজদের দেখি — তাদের মধ্যে একজন, আমার পরিচিত, ওর মেশিনের মাদারবোর্ড ৮১০, সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং ঘাটিয়া কার্ডগুলোর একটা, একদিন জিগেশ করলাম, তোর মেশিন কেমন চলছে, বলল — ভালোই তো, আজ সকালেও তো খুলে গান শুনলাম, মাঝেমধ্যে অবশ্য একটু হ্যাং করে। আপনার যদি কম্পিউটারের কাছে চাহিদা নিছক এটুকুই হয় — গান চালানো মাঝে মধ্যে তো ক্যাসেটের ফিতে জড়িয়েও থেমে যায়, কম্পিউটার হ্যাং করলেই বা কী হয় — তাহলে আপনি এই পাঠমালার পাঠক না, আপনি এই পাঠশালার এই আমাদের মত পাঠাদের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান, জীবনটা কাটিয়ে দেবেন চুয়িংগাম চিবোতে চিবোতেই। কিন্তু কম্পিউটার ব্যাটাকে তার সম্ভাব্য ক্ষমতার কাছাকাছি চালাতে গেলেও হার্ডওয়ারটা একটু বুঝতে হবেই।

আমাদের কলকাতা লাগ-এ (ilug-cal@ilug-cal.org) অনেক সত্যিকারের কম্পিউটার জানা লোক আছে। সবার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ও নেই, তবে তাতে কিছু এসে যায়না। আমার প্রেতমুম্বিত ডট-ম্যাট্রিক্স প্রিন্টারের (Epson LQ 300+) কোনো লিনাক্স ড্রাইভার নেই। লাগ-এ নালিশ করা মাত্রই, লাগ-এর মানস লাহা যেটা করেছিলেন সেটাকে বলা যায় নেটিউশনি — তাও ফি ছাড়া। দিন ছয়েকের গোটা পনেরো ইমেলের একটা টিউটোরিয়াল চলল। একটা ব্যাশ-স্ক্রিপ্ট লিখে কাঁচা ডেটার লেভেলে গোস্টস্ক্রিপ্ট বলে একটা সফটওয়ার দিয়ে প্রিন্টারটাকে চালানো হল — দিব্য চলছে — এই যে লিখছি, এই অসমাপ্ত মালটার তো একটা প্রিন্ট নিলাম, প্রেত কেন কোনো প্রেতিনীর চুম্বনেরও কোনো চিহ্ন নেই।

লাগ-এর অরিজিত হার্ডওয়ারটা বেশ ভালো বোঝে। আমি কোনো যন্ত্রপাতি কেনার বা সারানোর আগে ওর সাথে কথা বলে নিই। একটা বই রেফার করেছে — থম্পসন অ্যান্ড থম্পসন-এর পিসি হার্ডওয়ার ইন এ নাটশেল। চমৎকার একটা যন্ত্রপাতির ম্যানুয়াল। আপনাদের কারোর কোনো প্রয়োজন হলে লাগ-এ লিখবেন। এক লিনাক্সী অন্য লিনাক্সীর জন্যে দিবারাত্রি সমর্পিতমেল। এই লেখাটা পড়তে পড়তেও যদি কোনো কিছু বলার থাকে আমাদের জিএলটির ইমেল আইডিতে তো লিখতেই পারেন — সরাসরি আমাকেও লিখতে পারেন paagol@softhome.net। উত্তর পাওয়ার ব্যাপারে কোনো আশা রাখবেন না, আমি সরাসরি লিনাস টরভাল্ডসের নিজের হোমপেজ থেকে কোট করছি — কোটি বাতেলার সেরা বাতেলা সেটা — If you have any great suggestions, feel free to mail me,

and I'll probably feel free to ignore you । ছোট্ট একটা হোমপেজ — নিজের কোনো ছবি নেই — নিজের মেয়ের দুটো গেঁড়ি বয়সের ছবি, তার উপরে হেডিং 'লিনাস ভার্শন ২.০' — একবার ব্রাউজার-এ গুগলি মেরে দেখুন, লিনাস টরভাল্ডস দিয়ে সার্চ দিন।
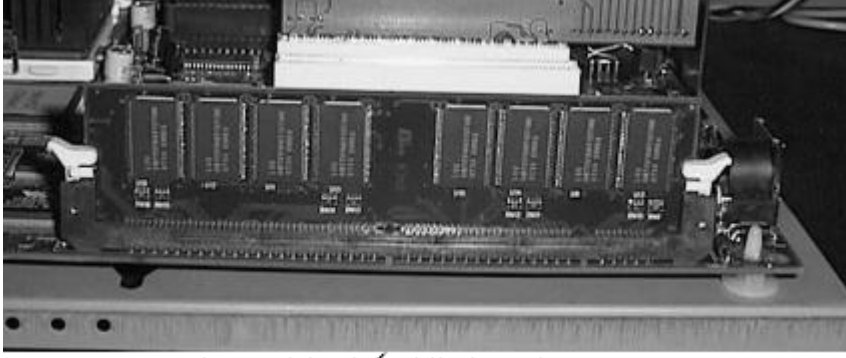
র‍্যাম — মাদারবোর্ডে লাগানো অবস্থায়

যাকগে, যা বলছিলাম, জয় শ্রীর‍্যাম। এখানে একটা কথা খেয়াল রাখুন — এর পরে র‍্যাম তথা ভৌতিক স্মৃতি বা ভার্চুয়াল মেমরি নিয়ে অনেক বেশি ডিটেইলস নিয়ে আলোচনা আছে, পাঁচ এবং ছয় নম্বর দিনে — এই রম আর র‍্যাম — এদুটোর কাজ করার গতি কিন্তু তথ্য তুলে রাখার জায়গা মানে হার্ডডিস্ক-ড্রাইভ, সিডিরম-ড্রাইভ ইত্যাদির চেয়ে অনেক বেশি। সিডিরম, মানে একবার পুড়িয়ে ফেলা সিডি, সেটাও রম, কিন্তু বদলানো সহজ, একটা সিডি বার করো, আর একটা ঢোকাও। আর হার্ডডিস্কেও তাই, একটা ফাইল মুছে আর একটা লেখো, এখানে লেখা স্মৃতি বদলানোটা তাই কোনো ইশু না, বিষয় হল এদের গতি — কতটা দ্রুত কে কাজ করতে পারে। র‍্যাম-চিপ, রম-চিপ অনেক বেশি দ্রুত, দামও বেশি। কম্পিউটার জগতের প্রায় সমস্ত ঘটনারই মূল নিয়ন্তাগুলোর একটা এই দাম।

ক্রমে আরো দ্রুত সিপিইউর সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে মেশিনে ব্যবহৃত র‍্যামের পরিমাণ বাড়ছিল। আমার ৪৮৬ মেশিনে ছিল ১৬ এমবি, কাজের জন্যে যথেষ্ট, কখনো সমস্যা বলে মনে হয়নি। এখন এই অ্যাথলন ১৮০০ এক্সপি প্লাস মেশিনে ২৫৬ এমবি নিয়েও প্রায়ই মনে হয়, আর একটু হলে ভালো হত, আরো গ্নু-লিনাক্সে মেমরির ব্যবহারটা এত ভালো। সত্যিই এত হাতে গরম ফলাফল পাওয়া যায় র‍্যাম বাড়ানোর। উইনডোজ-এ, খুব বেশি র‍্যাম মেশিনকে বরং স্লো করে দিতে পারে, সিপিইউ যখন রাশি রাশি র‍্যাম-এর পাতার পর পাতা ধারণক্ষমতার মধ্যে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলে। এর কারণটায় আমরা পরে আসব — উইনডোজ আসলে তার মৌলিক গঠন মোতাবেক মাল্টি-টাস্কিং সিস্টেম নয়, মাল্টি-টাস্কিং বা বহু-কাজীপনাটা উপর থেকে গুঁজে দেওয়া। প্রক্ষিপ্ত। চার নম্বর দিনে এটা ধরব আমরা। মাল্টিটাস্কিং ব্যাপারটা কী, এবং সেটা কী ভাবে চালু হয়েছিল কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেমে।

র‍্যামের পাশাপাশি আর একজন সহযোদ্ধা ক্যাশে (cache) মেমরি। র‍্যামের কাজের মধ্যের মধ্যের ফাঁক গুলোয় তাপ্পি মারার কাজ করে ক্যাশে। পরে অনেক ভালো করে বুঝব কম্পিউটারের পাঁচ রকম স্মৃতিকে, হার্ডডিস্ক, র‍্যাম, এক্সটার্নাল ক্যাশে, ইন্টার্নাল ক্যাশে এবং সিপিইউ-র নিজের ভিতরের রেজিস্টার। সবচেয়ে শ্লথ হার্ডডিস্ক, সবচেয়ে দ্রুত সিপিইউ রেজিস্টার। এগুলো এই মুহূর্তে ল্যাটিন লাগতে পারে, পরে স্পষ্ট হয়ে যাবে। ক্যাশে-র প্রয়োজনীয়তাটা এসেছে সিপিইউ-র গতি বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে। এই ক্যাশে বা একটু দ্রুততর কুচো র‍্যাম জুড়ে দেওয়া হয় মেশিনে — স্মৃতির অভাবে যাতে বসে বসে দাঁত দিয়ে নখ কাটতে না হয় সিপিইউর। ৪৮৬-র পর থেকে ক্রমে আরো উন্নত সিপিইউগুলোতে এই ক্যাশে দেওয়া থাকে আসলে সিপিইউ চিপেই। ইন্টারনাল ক্যাশে। কিছুটা দেওয়া থাকে মাদারবোর্ডে — এক্সটারনাল ক্যাশে।

০.৫.৩।। তথ্য রাখার ভাঁড়ার

আমরা একটু আগে যে তিন ধরনের স্মৃতির কথা বলেছিলাম তার মধ্যে তিন নম্বর হল এই তথ্যের ভাঁড়ারঘর। মানে ডিস্ক। হার্ড ডিস্ক, বা সিডি মানে কম্প্যাক্ট ডিস্ক, বা ফ্লপি ডিস্ক। বা এমনকি ক্যাসেট ড্রাইভ বা জিপ ড্রাইভ-ও হতে পারে। ক্যাসেট ড্রাইভ মানে যেখানে একটা ক্যাসেট রেকর্ডারই ড্রাইভ হিশেবে ব্যবহার হয়, তথ্য তুলে রাখা হয়

ক্যাসেটের ফিতের চৌম্বক তলে, এবং পরে প্রয়োজনমত পড়া হয় ওখান থেকেই। আজকাল আর ব্যবহার হয় বলে মনে হয়না, প্রচুর প্রচুর বিরাট পরিমাণ তথ্য রাখার জন্যে বরং জিপ ড্রাইভ ব্যবহার করা হয়।

সিডি ড্রাইভ এবং সিডি ক্রমশ আরো বেশি বেশি করে ব্যবহার হচ্ছে তথ্য রাখার, ঢোকানোর এবং বার-করার মাধ্যম হিশেবে। তথ্য বার করার জন্যে ব্যবহার করতে গেলে ড্রাইভটাকে বার্নার ড্রাইভ হতে হয় — মানে সিডির তলে লেজার রশ্মি দিয়ে

পুড়িয়ে তথ্য লিখে রাখার মত সরঞ্জাম লাগে। একটা সিডিতে তথ্য রাখা যায় ৬৫০ মেগাবাইটেরও বেশি। তুলনা করুন একটা ফ্লপির সঙ্গে — ১.৪৪ মেগাবাইট। আর সিডিতে তথ্যের ত্রুটি ঘটা অনেক অনেক কঠিন। এবং একটা সিডির দাম এখন একটা ফ্লপির চেয়ে কম। শুধু এই কম দামের সিডিগুলোয় একটা সেট তথ্যই রাখা যায়, মানে লেখা তথ্য মুছে ফের লেখা যায়না। যা যায় এই ঢের। প্রথমদিককার সিডি একবারই পোড়ানো যেত, তারপর এলো রিরাইটেবল সিডি, যা বারবার পোড়ানো যায়, তারপর এখন তো এদের জায়গায় আসছে ডিভিডির রাজত্ব। সিডিতে তথ্য লেখা এবং পড়ার জন্যে বিশেষ রকম একটা ফাইল ব্যবস্থা লাগে, আইএসও ৯৬৬০, তার বিশদ আলোচনা করব আমরা আট নম্বর দিনে গিয়ে।

ভাঁড়ার মানেই এমন একটা জায়গা, যেখানে ইচ্ছেমতন তথ্য তুলে রাখা যায়। স্বেচ্ছাস্মৃতি। যতক্ষণ চাইব ততক্ষণই থাকবে এই স্মৃতি। যখন চাইব বদলে ফেলব। রাখতে চাইলাম তো রেখে দিলাম, চাইলাম না তো ফাইলগুলো ডিরেক্টরিগুলো উড়িয়ে দিলাম। অন্যগুলোয় এটা আগে থেকেই ছিল, রিরাইটেবল সিডি বেরোনোর পর থেকে সিডির বেলাতেও এই একই ভাবে সত্যি। এবং এদের প্রত্যেকের বেলাতেই এটা সত্যি যে মেশিনে কারেন্ট থাকুক আর না-থাকুক তাতে এই তুলে রাখা স্মৃতির কিছু এসে যায়না।

ইচ্ছেমতন, হাতের পাশে বইয়ের তাকে যেমন, তুলে রাখলাম, নামালাম, যখন যেমন, এই ভাঁড়ারগুলোর সুবিধেটা এইখানে। কিন্তু এদের খারাপটা হল এদের গতি। ওই রম বা র‍্যাম চিপের তুলনায় বহু বহু কম। আধুনিক দ্রুত সিপিইউর নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করে চলার নিরিখে প্রায় অসম্ভব রকমের কম। তথ্য পড়া এবং লেখাতেই এতটা সময় চলে যায় যে সিপিইউ বেশিরভাগ সময়টা প্রায় বসেই থাকে। তার মানে, কম্পিউটারের কেন্দ্রীয় যে সত্তাটা, যাকে ঘিরে আর সব কিছু, সেই সিপিইউকেই আমরা তার পূর্ণ ক্ষমতার ধারেকাছেও ব্যবহার করে উঠতে পারিনা এই ডিস্ক ড্রাইভগুলোর দৌলতে। যে কারণে আজকাল ক্রমে বেশি আরপিএম (RPM — **R**otation-**P**er-**M**inute) আছে এমন হার্ড ডিস্ক ক্রমে জনপ্রিয় হচ্ছে আমাদের এখানেও। নইলে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয় যেখানে সেই কুকুরের ল্যাজ হাতে প্রেতযোনির মত সিপিইউ কাজের প্রতীক্ষায় ছটফট করছে কিন্তু শ্লথগতি ডিস্কড্রাইভ যথেষ্ট তাড়াতাড়ি তথ্য পড়ে বা লিখে উঠতে পারছেনা। আপনার মাথায় আগামী সাত লাইন তৈরি হয়ে গেছে, কিন্তু আপনার হাত অনেক পিছনে, লিখতে তার অনেক সময় লাগছে। এর টেকনিকাল নাম আইও-বটলনেক।

তথ্য রাখার এই জায়গাগুলোর তুলনায় র‍্যাম বা রম চিপ কাজ করে হাজার হাজার গুণ বেশি গতিতে। এই র‍্যাম আবার সিপিইউ-র তুলনায় অনেক অনেক শ্লথ। তাই সিপিইউকে কাজ করানোর জন্যে এই ড্রাইভগুলো থেকে তথ্য

তুলে র‍্যামে নিয়ে এসে জড় করে রেখে দেওয়া হয়। শুধু র‍্যামে না, পরে আমরা দেখব ভারচুয়াল মেমরি নামে হার্ডডিস্কেরই কিছু জায়গায়। গতিবেগের এই বিপুল তফাতের জন্যে এই তৃতীয় ধরনের মেমরিকে আমরা মেমরি বলে না ডেকে স্টোরেজ বা ভাঁড়ার বলে ডাকি। তথ্য রাখার একটা ভাঁড়ারঘর। মেমরি হল যেখান থেকে দ্রুত তথ্য পড়া বা লেখা যায় — র‍্যাম বা রম। আর ভাঁড়ার বা স্টোরেজ হল দীর্ঘ সময় ধরে তথ্য রেখে দেওয়ার জায়গা।

হার্ড ডিস্কের মধ্যে থাকে এক বা একাধিক শক্ত চাকতি (প্ল্যাটার) যাদের উপর একটা চৌম্বক আস্তরণ ফেলা থাকে। এই আস্তরণটাতেই তথ্য লিখে রাখা হয় বা পরে পড়া হয়, লেখা/পড়ার বিশেষ ছুঁচ বা রিড/রাইট হেড দিয়ে — হেডটা নড়ে এই
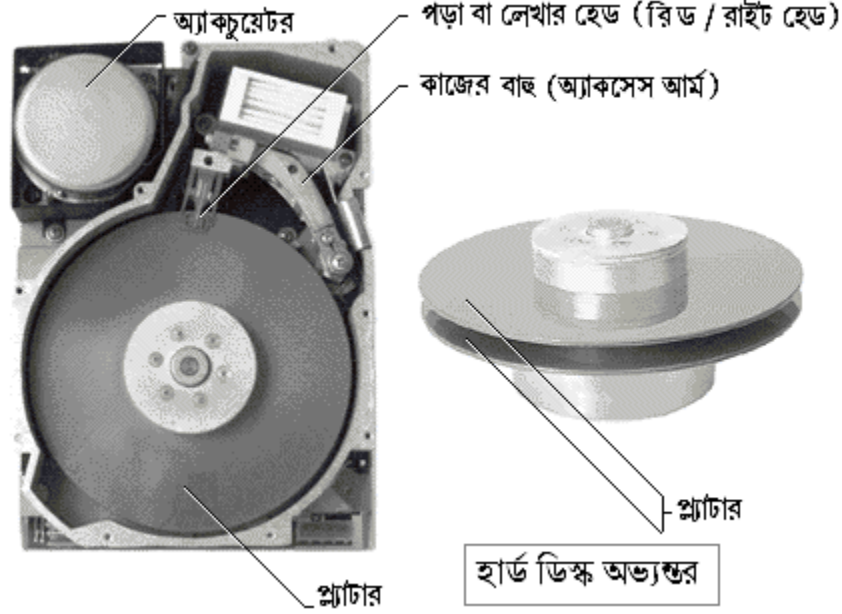
প্ল্যাটার-তলের খুব কাছ দিয়ে — ঘনিষ্ঠতাটা মোটামুটি এক ইঞ্চির আড়াইশো লক্ষ ভাগের এক ভাগ। এত নৈকট্যেও স্পর্শ না-করার সংযম দেখিয়ে হেডটা নড়ে বেড়ায় মিনিটে ৫৪০০ বার বা তারও বেশি গতিবেগে ঘূর্ণমাণ প্ল্যাটারপুঞ্জের তলে তলে, ডালে ডালে, পাতায় পাতায়। হেডের নড়াটাকে নিয়ন্ত্রণ করে কাজ করার বাহু বা অ্যাকসেস আর্ম। প্ল্যাটারটা বা প্ল্যাটারগুলো ঘোরে একটা স্পিন্ডল মোটরের সাহায্যে। এই স্পিন্ডল মোটর, হেড, অ্যাকসেস আর্ম এবং প্ল্যাটার সহ গোটাটা একটা চৌকো কৌটোয় ভরা থাকে — যাকে আমরা হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ বলি। আমাদের এই পাঠমালার ছয় সাত এবং আট নম্বর দিনে বারবার ফিরে ফিরে আসবে হার্ডডিস্কের এই ভৌত জ্যামিতি। ফাইলসিস্টেম পার্টিশন ইত্যাদি বুঝতে আমাদের ভীষণভাবে কাজে লাগবে।

এই ভাঁড়ারটা হয় মেমরির চেয়ে আকারে বহুগুণ বড়। যেমন আমার মেশিনে দুটো হার্ড ডিস্কে তথ্য রাখার ভাঁড়ারে মোট জায়গা চল্লিশ গুণ দুই সমান আশি গিগাবাইট। আর র‍্যাম, আগেই তো বললাম, দুশো ছাপ্পান্ন মেগাবাইট। এই মেগাবাইট গিগাবাইট বাইট এগুলো আমরা একটু বাদেই ভালো করে বুঝব। আপাতত জেনে রাখা যাক এক গিগাবাইট হল ১০২৪ মেগাবাইট। এক মেগাবাইট হল ১০২৪ কিলোবাইট। এক কিলোবাইট মানে ১০২৪ বাইট।

০.৬।। তথ্য নিয়ন্ত্রণ বা কন্ট্রোল ডিভাইস

আগেই বলেছি কম্পিউটারের মূল কাজ হল ডেটা প্রসেস করা, আমরা যাকে তথ্য চটকানো বলে ডেকেছি। কিন্তু কম্পিউটার তো সেটা আপনা থেকে এমনি এমনি করেনা, তাকে সেটা করাতে হয়। তার জন্যে তাকে নির্দেশ দিতে হয়। নির্দেশ যায় কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশগুলোর কাছে যাতে তারা তাদের প্রত্যেকের ভূমিকা পালন করে — নইলে মোট কাজটা হতে পারবে না। ইনপুট ডিভাইস ব্যবহার করা মানে তথ্য ঢোকানোর যন্তরগুলোকে বলতে হবে, ঢোকাও বাবাসকল, যাতে তারা চটকানোর তথ্যগুলোকে প্রথমেই ঢুকিয়ে আনে। শুধু চটকানোর তথ্য না, কী ভাবে চটকাবে সেই রেসিপিটাও। এবার যে তথ্য চটকাতে হবে আর যে নির্দেশ অনুযায়ী চটকাতে হবে — এই দুই ধরনের তথ্যকে কোথাও চট করে হাতের কাছে পাওয়ার মত জায়গায় তুলে দেওয়ার নির্দেশও দিতে হবে সিস্টেমকে, নইলে

সে কাজ করতে গিয়ে বারবার তো দিশাহারা হয়ে পড়বে। সচরাচর এই চট করে তুলে রাখা এবং চট করে ফিরে পাওয়ার জায়গাটা হল পিসির মূল মেমরি। এর মধ্যে আবার বহু ছোট ছোট নির্দেশের টেকনিকালতা আছে। আছে তার ভিতর আগে পরে-র সময়রেখা বা ক্রোনলজি। ঠিক ঠিক প্রথা অনুযায়ী, হার্ডওয়ারের নিজস্ব ব্যাকরণ অনুযায়ী এই নির্দেশগুলোকে আবার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

নির্দেশ এবং নিয়ন্ত্রণের এই গোটা কাজটা কম্পিউটারের যে অংশটা করে তাকে বলে কন্ট্রোল পোর্শন বা নিয়ন্ত্রক অংশ। এই কন্ট্রোল পোর্শনের প্রায় গোটাটাই থাকে সিপিইউ চিপে। সিপিইউ চিপের মধ্যে ভরা থাকে চটকানোর আর নিয়ন্ত্রণের, প্রসেসিং-এর আর কন্ট্রোলের দু-ধরনের যন্ত্রপাতিই। এই দু ধরনের বস্তু ছাড়া আরো একটা বস্তু থাকে এই সিপিইউ চিপে — কম্পিউটারের দ্রুততম মেমরি — সিপিইউ রেজিস্টার, এবং দ্বিতীয় দ্রুততম মেমরি — ক্যাশে। আরো ভাল করে এটা আমরা পরে বুঝব। কন্ট্রোল পোর্শন বা নিয়ন্ত্রক অংশের একটুখানি থাকে সিপিইউ চিপের বাইরে — সেটা হল চিপ-সেট আর এমবেডেড কন্ট্রোলার চিপ। এদুটো নিয়ে আমরা আলোচনা আমাদের এই গোটা পাঠমালাতেই আনবনা। এগুলো নিয়ে আলোচনা করার যোগ্যতাও আমার নেই । তবে এই নিয়ন্ত্রণ অংশ নিয়ে আলোচনায় আমাদের বারবার ফিরে ফিরে আসতে হবে। তার হার্ডওয়ার তার সফটওয়ার, তার লুপ, তার প্রোগ্রামিং ইত্যাদি। তিন নম্বর দিনে আডা লাভলেসের আলোচনায় আমরা কম্পিউটার চিন্তায় এর প্রাচীনতম চেহারাটাকে দেখতে পাব। আর এই বইয়ের মাপে সবচেয়ে জটিল রকমে এই আলোচনাটা আসবে আমাদের শেষতম মানে দশ নম্বর দিনে, প্রায় শেষ অংশে, সেখানে এই নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে ব্যাশ শেলের সম্পর্কটাকে দেখব আমরা।

এই কন্ট্রোল পোর্শনটাকে ছেঁটে দিলে একটা পিসি কিন্তু একটা কোট-টাই-পরা ক্যালকুলেটরের চেয়ে বেশি কিছু নয়। ক্যালকুলেটরেও তো বেড়ে তথ্য ঢোকানো যায় — ০ থেকে ৯ অব্দি অঙ্কের চাবি আর +, –, ×, ÷ — এই অপারেশন চাবিগুলো দিয়ে। এবং তথ্য বার করেও চমৎকার, এবং বেশ তাড়াতাড়ি। যে হিশেবটা করছে সেটা করতে যত গাবদা গাবদা সংখ্যা যতক্ষণ ধরেই লাগুক — সেই পুরো সময়টা জুড়ে ততটা ধরে রাখবার মত মেমরিটা এর আছে। এবং ততটা প্রসেসিং ক্ষমতা এর নিশ্চয়ই আছে যতটা থাকলে ওই হিশেবগুলো করা যায়। তাহলে ক্যালকুলেটরটার কী নেই যা একটা পিসির আছে? তফাতটা এই যে প্রতিটি বোতামই নিজে টিপে দিতে হবে প্রত্যেকবার — নিজের কাজের বোতাম নিজে নিজে টিপে নেওয়ার ক্ষমতাটা ক্যালকুলেটরটার নেই। যেকোনো প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটরকে একটা দূর অব্দি, কয়েকটা স্টেপ-এর হিশেব অব্দি, নিজের বোতাম নিজে টিপে নেওয়ার ব্যবস্থা করানো যায় — এবং সেই দূরত্বটা অব্দি ক্যালকুলেটরটাকে একটা কুচো মাত্রার কম্পিউটার বলা যায়। কিন্তু ওই হাতে গোনা স্টেপকটাতে একটা চিকণতম সি প্রোগ্রামও তাতে দৌড় করানো যাবেনা। আসলে মাত্রাই তো সব। মাত্রার তফাতই লুচি আর বিষের একমাত্র তফাত। লুচি আর পটাশিয়াম সায়ানাইড তো একেবারে একই বিষ — দুটো খেলেই মানুষ মরে একইরকম ঠান্ডা হয়ে যায়। বিশ্বাস না হলে আপনি এক সিটিং-এ তেরোশো বাহাত্তরটা লুচি খেয়ে দেখুন — ওর চেয়ে কম খেলেও আপনি নিশ্চিতভাবেই মরবেন কিনা আমি বলতে পারবনা, সরি, কখনো খেয়ে দেখিনি। খেয়ে দেখুন — মরে গেলে জানাবেন। তেরোশো বাহাত্তর ফিগারটা কমিয়ে দেব।

০.৭ ।। একটা সারণী — কাজ ভার্সাস উপাদান

সারণী শব্দটা এমন শক্ত কিছু নয় — ওর বাংলা হল টেবিল। একটা তালিকা তৈরি করা যাক এবার — এই শূন্য নম্বর দিনে একটা পিসির যে বিভিন্ন অংশগুলো আমরা আলোচনা করলাম — তার কোনটা কী বা কী কী কাজ করে।

এখানে দুটো জিনিষ মাথায় রাখার। এক, আমরা আমাদের এই আলোচনায় হাতে গোনা কয়েকটা মাত্র ধরনের যন্ত্রপাতিকেই এনেছি। যেগুলোয় আমরা সবচেয়ে বেশি অভ্যস্ত। বা, বলা ভাল, আমি। আমার মেশিন, আমার বন্ধুদের মেশিনে যেসব যন্ত্রপাতি দেখেছি। এই নিজের পছন্দমত জিনিষপত্তর নিয়ে লেখার অধিকারটা আমার আগাগোড়াই ছিল। কারণ, আমি কোনো টেক্সটবই লিখছি না। আমাদের মধ্যমগ্রাম জিএলটির সূত্রে যেসব ছেলেমেয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে, যাদের পড়াতে শুরু করলাম এই লিনাক্স-হাতেখড়ি কোর্সে, তাও তো এটাই প্রথমবার, তাদের কাছে পৌঁছনোটাকে সহজ করার জন্যে এই লেখাটা শুরু। তাও তো এই ০ নম্বর লেখাটা মূল প্ল্যানে ছিলই না। শুরুই হচ্ছিল ১ থেকে। ৯ অব্দি হয়ে গেছিল। এর মধ্যে যারা এই সিরিজটা পড়ল তার ভিতর

সোমনাথ আর বুড়িয়া প্রবল চেঁচাল, কিছুই বুঝতে পারছেনো বলে। সেটা অবভিয়াসলি ওদের বুদ্ধির দোষ, আমার লেখার নয়। কিন্তু কী করি, লিখতেই হল এই ০ নম্বরটা।

আর দু নম্বর বিষয়টা কম্পিউটার শাস্ত্রের নিরিখে আর একটু জরুরি। এতক্ষণ অব্দি যে আলোচনাটা আমরা করে এলাম তাতে পিসি ছাড়া কোনো পিসেমশাইয়েরই নাম করিনি। কিন্তু এই পিসেমশাইরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ কম্পিউটারের ইতিহাসে। তিন চার এবং পাঁচ নম্বর দিনে আমরা সেটা পড়ব। অন্যান্য প্রবীন কম্পিউটার বা পিসেমশাইদের তুলনায় পার্সোনাল কম্পিউটার বা পিসি অনেক অর্বাচীন। কিন্তু এখানেও মূলত ওই বুড়িয়া-সোমনাথদের মত পাঠকদের কথা ভেবেই পিসি ছাড়া আর কিছু আনলাম না। এবং একদম ছুঁলাম না অপারেটিং সিস্টেমকে। ইউনিক্স, লিনাক্স, উইনডোজ — কিছুই না। সেসব শুরু হবে ১ নম্বর দিন থেকে। কিন্তু এই তালিকাটা পড়ার সময়ে আমরা এটা মাথায় রাখব যে এটা বানানো পিসির উপাদানগুলোর নিরিখে। মেইনফ্রেম বা অন্য কম্পিউটারের বেলায় মাত্রার বদলটা এত নাটকীয় হয় যে এমনকি উপাদানগুলোর প্রাথমিক ভূমিকাটাও অনেকসময়ই একদম বদলে যায়। মাত্রা জিনিষটা কতটা জরুরি তাতো তিন প্যারা আগেই বললাম। এবার তালিকাটা দেখুন — এখানে বাঁদিকের স্তম্ভে পরপর আছে উপাদানগুলোর নাম। আর একদম উপরের সারিটায় কাজগুলোর নাম।

অংশের নাম	কাজ				
	তথ্য ঢোকানো	তথ্য বার-করা	তথ্য চটকানো	তথ্য ধরে-রাখা	তথ্য নিয়ন্ত্রণ
কিবোর্ড	✓	×	×	×	×
মাউস	✓	×	×	×	×
ট্র্যাকবল	✓	×	×	×	×
মাইক্রোফোন	✓	×	×	×	×
ফ্লপি ডিস্ক	✓	✓	×	✓	×
সিডি-আর	✓	✓	×	×	×
সিডি-আরডব্লু	✓	✓	×	✓	×
হার্ড ডিস্ক	✓	✓	×	✓	×
জিপ ড্রাইভ	✓	✓	×	✓	×
সাউন্ডবক্স	×	✓	×	×	×
মনিটর	×	✓	×	×	×
প্রিন্টার	×	✓	×	×	×
আলু (সিপিইউ)	×	×	✓	×	×
ক্যাশে (সিপিইউ)	×	×	×	✓❋	×
কন্ট্রোল সার্কিট (সিপিইউ)	×	×	×	×	✓
মাদারবোর্ড চিপ সেট	×	×	×	×	✓
মাদারবোর্ড রম	×	×	×	✓❋	×
মাদারবোর্ড র‍্যাম	×	×	×	✓❋	×

× মানে এই উপাদানটা এই কাজ করেনা, ✓ মানে এই উপাদান এই কাজ করে, আর ❋ চিহ্নটা বোঝাচ্ছে যে এই ধরে-রাখাটা একটু আলাদা, হয়, নিতান্তই ক্ষণিকের অতিথি — একবার মেশিন বন্ধ হলেই উবে যাবে, নয়তো, ইচ্ছে হলেই বদলানো যাবেনা। এরা স্টোরেজ ডিভাইস বা ভাঁড়ার থেকে আলাদা, একটু আগে যাদের আমরা মেমরি বলে ডেকেছিলাম। স্টোরেজ বা ভাঁড়ার হল তারা, যেখানে রাখতে বা বাদ দিতে পারি আমরা যখন খুশি যেভাবে খুশি যত সময় খুশি।

০.৮।। কম্পিউটার এবং তথ্য

আগেই বলেছি বারদুয়েক, এবং এই পাঠমালা জুড়ে আরো বারংবার বলব, কম্পিউটার বেচারার ভাষাবোধ দরিদ্র বললেও কম বলা হয়। মালটা একদমই আকাঠ, ০ আর ১ ছাড়া কিছু বোঝেনা। যে কোনো তথ্যকেই কম্পিউটার বোঝে এই ০ আর ১ দিয়ে। এইভাবে কম্পিউটারকে কোনো তথ্য বোঝানোর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে।

এই ভাবে ০ আর ১ দিয়ে কোনো তথ্যকে বোঝানো মানে একভাবে সেটাকে সম্পূর্ণ রকমের নির্মল বা নয়েজ-মুক্ত বা ত্রুটিহীন করে তোলা গেল। কোনো তথ্যকে অনেক ভাবে রাখা যেতে পারে। যেমন ধরুন একটা গান। সেই গানের আওয়াজটাকে আমরা ম্যাগনেটিক একটা ফিতেয় তুলে রাখতে পারি। যেখানে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ এলাকায় মোট চৌম্বক অনুর উপস্থিতির মাত্রা দিয়ে শব্দের বিভিন্ন প্রকারকে, তাদের বিভিন্ন ওঠানামাকে ধরে রাখা হয়। এই ভাবে শব্দ ধরে রাখতে গিয়ে আমরা গানের পাশাপাশি যে কী বিপুল পরিমাণ কোলাহলও ধরে রাখি সেটা আমরা সবসময় খেয়াল করিনা। খুব সহজ একটা এক্সপেরিমেন্ট করা যায়। একটা গানকে একটা ক্যাসেট থেকে অন্য ক্যাসেটে রেকর্ড করুন। দ্বিতীয়টার থেকে আবার প্রথমটায়। এরকম করে একশোবার করার পর শেষ ক্যাসেটটায় গানটাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবেনা। মোট কোলাহল বা নয়েজ-এর পরিমাণ তখন গানের মূল আওয়াজকে ছাপিয়ে গেছে। একটা ক্যাসেটে অনেকদিন গান রেকর্ড হয়ে থাকার পর, প্রকৃতির প্রকোপে, আরো আমাদের ভিজে আবহাওয়ায়, বা, অনেকবার বাজানোর পর, এই ম্যাগনেটিক আস্তরণে আওয়াজ ধরে রাখার ব্যথাটা যেমন আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাই।

কিন্তু কম্পিউটার একবার যখন সেই আওয়াজটাকে ০ আর ১-এ পর্যবসিত করে নিল, সেটার একটা মস্ত ভালো জায়গা চলে এল। এই ০ আর ১-এর পদ্ধতি, যার টেকনিকাল নাম বাইনারি, সেটা মেনেই কম্পিউটার এবার ফের শব্দটাকে বানিয়ে নেবে। সে জানে কোন বাইনারি কম্বিনেশন মানে কী আওয়াজ বানাতে হবে — সেটাই তার অডিয়ো বা মাল্টিমিডিয়া সফটওয়ারের কাজ। ধরুন ম্যাগনেটিক টেপেও যেমন ব্যবহারের বা কালের বলীরেখা পড়ছিল সেরকম পড়ল সিডির রেকর্ডেবল তলেও। এবার, যখন সে ০ আর ১ হিশেবে সিডির রেকর্ডযোগ্য আস্তরণে লেজারের পোড়ানো গর্তগুলোকে পড়তে যাবে তখন ০ এবং তার সমস্ত কাছাকাছি প্রতিক্রিয়াকেই সে ফের ০ করে দেবে। ০ থেকে তার ঠিক বিপরীত ১ হয়ে ওঠাটা প্রায় অসম্ভব। আবার ১-এর বেলাতেও তাই। অর্থাৎ, যথেষ্ট পরিমাণ মেকানিকাল বা যান্ত্রিক ত্রুটি সিডিটায় থাকলেও শেষ অব্দি তার ফলাফলটা ত্রুটিমুক্তই হবে।

এবার প্রশ্ন আসে তথ্যের মোট পরিমাণটাকে আমরা মাপব কী করে? একটা ব্যাপার আছে, খুব কম্পিউটার আসার আগে অব্দি খুব নিখুঁত ভাবে মাপার প্রয়োজনও পড়ত না, মাপাটা সম্ভবও ছিলনা। যেমন মনে আছে, এমএসসির পরপরই বারোমাস পত্রিকায় 'সুমিতার ডাকনামে মিনু' বলে একটা বড় গদ্য ছাপার আগে সম্পাদক অশোক সেন, উনি ইকনমিক্সে মাস্টারমশাইও ছিলেন, আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, কত ওয়ার্ডের লেখা? এই প্রশ্নটাই যে হয় সেটা সেই প্রথম জানলাম। বেরিয়ে এসে আফসার আমাকে শেখাল, আরে দুতিন জায়গার দুতিনটে লাইন থেকে শব্দের সংখ্যাটা গুনে নাও, তারপর দুতিন জায়গার দুতিনটে পাতা থেকে লাইনের সংখ্যাটা গোনো, এবার শব্দ গুণ লাইন গুণ পাতা মানেই মোট শব্দ। আমার এইচএস থেকে স্ট্যাটিস্টিক্স ছিল, রাশিশাস্ত্রের এতাবৎ বীভৎসায় আমি শিউরে উঠেছিলাম, কিন্তু পরে দেখেছি, বেশ কাজে দেয়।

এখন তো কম্পিউটারের কল্যাণে এটা কোনো ব্যাপারই না, আরো আমার তো বাঁয় হাত কা খেল, কারণ আমি বাঁ হাতে মাউস চালাই, প্রথম থেকেই, ডান হাতটার জন্যে জরুরিতর কাজ থাকে, চায়ের কাপ সিগারেট ইত্যাদি। শুধু মাউস টিপেই এক নিমেষেই বলে দেওয়া যায়। যেমন ঠিক এই আগের দাঁড়িটা অব্দি এই লেখাটায় পাতা ২৩ (এ-ফোর সাইজ), শব্দ ৯৫৬৬, স্পেস-সহ অক্ষর ৬৯১৩৪, প্যারা ২০৫, লাইন ৭৬৭। এটা এখন মাপার দরকারও পড়ে অনেক। যেমন এটা লিখছি আর মনে মনে হায় হায় করছি এই ভেবে যে এই সিরিজের অন্য লেখাগুলোর মত (এই সিরিজের ১ থেকে ১০ ইতিমধ্যেই লেখা হয়ে গেছে, বলেছি) এটা লাগ-এর তথাগত সায়মিন্দু সঙ্কর্ষণ ইন্দ্র অরিজিতকে বা সৈকত জয়ন্তী অশেষ অশোকদাকে ইমেল করে পাঠাতে গেলে কান্না পাবে, কারণ, এইমাত্র একবার পিডিএফ করে দেখলাম, সাইজ এর মধ্যেই ১ এমবি অতিক্রম করে গেছে — অতোগুলো ছবি যে।

কতটা পরিমাণ সম্ভাব্য ভাঁড়ারে কতটা তথ্য আমায় রাখতে হবে এটা এখন একটা জরুরি প্রশ্ন। রাখা এবং একটা মেশিন থেকে আর একটা মেশিনে তাকে পাঠানো। বা, এমনকি, একটা প্রোগ্রাম একটা ফাইল খোলার সময় কতটা মেমরি তার জন্যে ছেড়ে দিতে হবে — ইত্যাদি। তাই মাপতে হবেই। কিন্তু মাপব কী করে?

০.৮.১।। তথ্যের পরিমাপ

একটা প্রশ্নের সবচেয়ে সরল উত্তর কী হতে পারে? হয় হ্যাঁ, অথবা না। ১, অথবা ০। এবং এই হ্যাঁ বা না দিয়ে উত্তর দেওয়া যায় এমন প্রশ্নের সঠিক উত্তর রাখতে ধরে রাখতে গেলে আমার কতটা মেমরি লাগবে? ঠিক ততটুকু জায়গা যেখানে রাখা যায় হয় একটা ১ অথবা একটা ০। ঠিক এইটুকু জায়গাকেই, যেখানে হয় একটা ১ রাখা যায় নয় একটা ০, ঠিক এটাকেই বলে বিট (BIT — **B**inary-dig**IT**) — কম্পিউটারের তথ্য পরিমাপের ক্ষুদ্রতম একক।

গণিতের হিশেবে একটা বিট-এর মান হতে পারে হয় ১ অথবা ০। এর মানে হতে পারে সত্যি/মিথ্যে, বা, হ্যাঁ/না, বা, আছে/নেই — এর যে-কোনোটাই। বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ারিং-এর নিরিখে এটাকে যান্ত্রিক কাঠামোয় এই রকম একটা আকারে পর্যবসিত করা যায় যে একটা সার্কিটে বিদ্যুৎ আছে না নেই। বা, সার্কিটে ভোল্টেজের মান উঁচু না নিচু? আবার যখন ক্যাসেট ড্রাইভে কম্পিউটার তার তথ্য তুলে রাখছে বা সেখান থেকে পড়ছে তখন এটা হতে পারে একটা বিশেষ চৌম্বক ক্ষেত্রের মেরুটা এইদিকে আছে না এর বিপরীত দিকে। এরকম অনেক ভাবেই এই শূন্য/এক-এর এক বিট তথ্যকে রাখা যেতে পারে।

এইভাবে তথ্য রাখা মাত্রই সবচেয়ে বড় যে জিনিষটা ঘটল তা হল, এখন থেকে সম্পূর্ণ গাণিতিক রকমের নিখুঁত ভাবে বলে দেওয়া যাবে তথ্যের পরিমাণ ঠিক কতটা। একটা প্রশ্নমালার উত্তর দিতে ঠিক কতগুলো বিট লাগবে। মানে ব্যাপারটা অনেকটা এরকম — একটা জটিল প্রশ্নকে অনেকগুলো সরল প্রশ্নে ভেঙে নেওয়া যাদের প্রত্যেকটাকেই একটা হ্যাঁ বা না দিয়ে উত্তর দেওয়া যাবে।

তথ্য পাঠানো বিষয়ে একটা পুরোনো গল্প এইরকম। একটা শহরে কোনো আক্রমণ হচ্ছে কিনা অনেক দূরে একটা উঁচু জায়গায়, একটা লাইটহাউসে বসে একজন পাহারা দিচ্ছে। সে যদি দেখে, আক্রমণকারীরা নৌকো করে সমুদ্রপথে আসছে তাহলে সে একটা আলো জ্বেলে দেবে। যদি দেখে তারা ঘোড়ায় চড়ে স্থলপথে আসছে তাহলে সে দুটো আলো জ্বেলে দেবে। তার মানে এখানে সম্ভাব্য উত্তর তিনটে।

(১) কোনো আলো জ্বলেনি — আক্রমণ এখনো হচ্ছে না — সংখ্যা ০

(২) একটা আলো — জলপথে আক্রমণ হচ্ছে — সংখ্যা ১

(৩) দুটো আলো — স্থলপথে আক্রমণ হচ্ছে — সংখ্যা ২

এই তিনটে উত্তর সংখ্যা দিয়ে রাখতে গেলে লাগবে ০/১/২। এই মাত্র তিনটে উত্তরেই হয়ে গেল কারণ এখানে তথ্যটা খুব একটা জটিল নয়। তার সম্ভাব্য সমাধানের সংখ্যা মাত্র তিন। ধরুন সম্ভাব্য উত্তরের সংখ্যা যদি ১০০ হয়ে যায় তখন এইভাবে আলো দিয়ে তথ্য পাঠানোটা অসম্ভব রকমের জটিল হয়ে পড়বে। এই সদ্য কালীপুজোর রাতে ছাদে প্রদীপ জ্বালানোর জ্যান্ত এবং টাটকা অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, কয়েকটা আলো হলে একদিক থেকে জ্বালাতে জ্বালাতে অন্যদিক থেকে নিভে যেতে শুরু করবে। শেষে এনলাইটেনমেন্টহীন হতাশায় আমি স্থির করেছিলাম, এর চেয়ে অন্যদের ছাদে জ্বালানো আলো দেখাটাই সবচেয়ে ভালো। আরো লাইটহাউস, সমুদ্রের হাওয়া হুহু করে বইছে, ওতো জ্বালানোই যাবেনা।

০.৮.২।। আঙ্কিক তথ্যের আকার ও পরিমাণ

আমার ঠাকুর্দা আজ থেকে বছর ছয়েক আগে একশো তিন বছর বয়সে মারা গেছিলেন। বেঁচে থাকলে এখন স্কোর হত একশো নয়। ধরুন তিনি বেঁচে আছেন এবং এই ক্ষীণজীবী ক্ষণজীবী বিশ্বে তাঁর এই বিস্ময়কর বয়সটা আপনি নিজেই যাচাই করে নিতে চাইছেন। আপনি ধরে নিলেন, ঠাকুর্দার বয়সটা ১২৮-এর কম, তার অর্ধেক করলেন। ৬৪। এবার প্রশ্ন করলেন, আপনার বয়স কি ৬৪ বা তার বেশি?

উত্তর হল হ্যাঁ, — মানে ১।

এবার দেখলেন উপরের মানে ১২৮ থেকে ৬৪-র অবশিষ্টের অর্ধেক মানে ৬৪-র অর্ধেক হল ৩২। ৬৪ আর ৩২ হল ৯৬। এবার জিগেশ করলেন, আপনার বয়স কি ৯৬ বা তার বেশি?

উত্তর হল, হ্যাঁ — মানে ১।

এবার ৯৬-এর সঙ্গে যোগ করলেন উপরের অবশিষ্টের অর্ধেক মানে ১৬। ৯৬ আর ১৬ হল ১১২। জিগেশ করলেন, আপনার বয়স কি ১১২ বা তার বেশি?

উত্তর হল, না — মানে ০।

এবার ৯৬ এবং ১১২-র যে দূরত্ব মানে ১৬, তার অর্ধেক মানে ৮ যোগ করলেন ৯৬-এর সঙ্গে। পেলেন ১০৪। জিগেশ করলেন, আপনার বয়স কি ১০৪ বা তার বেশি?

উত্তর হল, হ্যাঁ — মানে ১।

এবার ১০৪ আর উপরের মান ১১২-এর মধ্যের ফারাক মানে ৮-এর অর্ধেক মানে ৪ যোগ করলেন ১০৪-এর সঙ্গে। পেলেন ১০৮। জিগেশ করলেন, আপনার বয়স কি ১০৮ বা তার বেশি?

উত্তর হল, হ্যাঁ — মানে ১।

এবার ১০৮ আর ১১২-র ফারাক ৪-এর অর্ধেক মানে ২ যোগ করলেন ১০৮-এর সঙ্গে। জিগেশ করলেন, আপনার বয়স কি ১১০ বা তার বেশি?

উত্তর পেলেন, না — মানে ০।

এবার ১০৮ আর ১১০-এর ফারাক মানে ২-এর অর্ধেক মানে ১ যোগ করলেন। জিগেশ করলেন, আপনার বয়স কি ১০৯ বা তার বেশি?

উত্তর পেলেন, হ্যাঁ — মানে ১।

এবার পরপর এই অঙ্কগুলো লিখে ফেলুন — ১১০১১০১। এই উত্তরটা মনে রাখুন। এটা একটা বাইনারি সংখ্যা। এখানে এককুচো একটু বাইনারি আর ডেসিমাল নিয়মের তফাতটা বুঝে আসা যাক।

০.৮.২.১।। এইরে, অঙ্ক কষাচ্ছে

বাইনারি মানে যেখানে অঙ্ক বা ডিজিটগুলো, যেগুলোকে মিলিয়ে আমরা সংখ্যা বা নাম্বার পাই — তারা হল ০ আর ১। বাইনারি হল এই দুই অঙ্কের সিস্টেম। যেমন আমরা দশমিক বা ডেসিমাল প্রক্রিয়ার সঙ্গে অভ্যস্ত। যেখানে ডিজিটের সংখ্যা দশ। ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, এবং ৯।

এবার এই দশমিক পদ্ধতিতে লেখা একটা সংখ্যাকে ভাবুন — ধরুন ৩৪৫। মুখে কী ভাবে পড়লেন? তিনশো পঁয়তাল্লিশ। তিনশো, চল্লিশ, পাঁচ।

$$
\begin{aligned}
৩৪৫ &= (৩০০ + ৪০ + ৫) \\
&= ((৩ \times ১০০) + (৪ \times ১০) + (৫ \times ১)) \\
&= ((৩ \times ১০^{২}) + (৪ \times ১০^{১}) + (৫ \times ১০^{০}))
\end{aligned}
$$

তার মানে ৩৪৫ এই সংখ্যাটার প্রতিটি অঙ্ক গুণ হয়ে যাচ্ছে ১০-এর কোনো একটা পাওয়ার দিয়ে — ০, ১, ২, ইত্যাদি। যত বড় সংখ্যা হবে এই গুণক-টার সূচক বা পাওয়ারটা এক এক করে বেড়ে যাবে। এবং এই দশ সংখ্যাটা কেন হল এখানে? কেন এটা অন্য কোনো সংখ্যা নয়? কারণ, আমাদের এই কাঠামোয়, ডেসিমাল সিস্টেমে বা দশমিক পদ্ধতিতে অঙ্কের সংখ্যা দশ। যুক্তিটা একটু খেয়াল করুন। প্রথমে একদম ডানদিকের ঘর — মানে এককের ঘর — যেখানে ১ দিয়ে গুণ করছি। সেখানে ০ থেকে ৯ অব্দি দশটা সংখ্যা পরপর আসছে, সংখ্যাটা এক এক করে বাড়ছে। যেই ৯-এ পৌঁছে গেলাম, আর বাড়ানোর উপায় নেই। ঘর তো মাত্র একটা। সঙ্গে সঙ্গে পরের মানে দশকের ঘরে ১ বসালাম, আর এককের ঘরে এখন কিছু নেই, তাই ০। মানে সংখ্যাটা হল ১০। আবার বাড়াচ্ছি সংখ্যাটাকে এক এক করে। বাড়াতে বাড়াতে ১১ থেকে ১৯। এবার কিন্তু বাড়ানোর উপায় আছে আরো অনেকক্ষণ। দশকের

ঘরটাতে ১-কে ২ করে দিলাম। আবার এককের ঘরে ০। এই করে চলল ৯৯ অব্দি। যখন এককের ঘরে ৯, দশকের ঘরে ৯। আবার স্পেস শর্টেজ। মানে পরের ঘরে যাও কাকা। পেলাম ১০০। যার শতকের ঘরে দিলাম ১। দশক আর এককে পড়ল ০। এইভাবে চলতেই থাকবে।

এবার ভাবুন এককের ঘরে একটা অঙ্ক বাড়ানো মানে আমি বাড়াচ্ছি এক এক করে। তাই গুণক হল ১ মানে $১০^{০}$, কিন্তু দশকের ঘরে একটা অঙ্ক এক বাড়ানো মানে তার পিছনে বাড়তে পারছে এককের ঘরে ০ থেকে ৯ মানে মোট দশটা সংখ্যা। তার মানে এই ঘরে ১ বাড়ানো আসলে ১০ বাড়িয়ে দেওয়া। তাই দশকের ঘরে মানে দ্বিতীয় ঘরে গুণক ১০ মানে $১০^{১}$। ঠিক এই একই যুক্তিতে শতকের মানে তৃতীয় ঘরে ১ বাড়ানো মানে আসলে তার পিছনে দশকের ঘরে ০ থেকে ৯ এই দশটা সংখ্যা বাড়ানো। মানে, ঠিক আগের যুক্তিতে, এককের ঘরে ১০ গুণ ১০ মানে ১০০টা সংখ্যা বাড়ানো। কারণ, দশকের ঘরে ১ বাড়া হল এককের ঘরে ১০ বাড়া। ০ থেকে ৯৯ এই একশোটা সংখ্যা বাড়তে দেওয়া। তাই এই ঘরে গুণক ১০০ মানে $১০^{২}$। এই ভাবে প্রতিটি ঘরে গুণকটা বাড়বে ১০ এর পাওয়ার বা সূচকে এক এক করে।

এবার ঠিক এই যুক্তিটাকে ডিটো কপি করে দিন বাইনারি সিস্টেম বা দ্বিত্ব পদ্ধতিতে। শুধু ডেসিমালের জায়গায় বাইনারি। মানে ১০ এর জায়গায় ২। মানে ০, ১ . . . , ৯ এর জায়গায় ০, ১। কিন্তু যেই বদলালাম, গুণ করে একক থেকে দশক থেকে শতক এগিয়ে যাওয়ার কাঠামোটা একই রইল। শুধু গুণকের মানটা এবার আর ১০ নয়, ২। কারণ সংখ্যা বাড়ানো যায় ০ থেকে ১। তারপরে আর অঙ্ক নেই। তাই যাও পরের ঘরে। আগের বার যেটা বাড়ত ১০ করে এখন সেটা ২ করে বাড়ছে।

তার মানে, এবার এই গুণকগুলোর একটা তালিকা বানানো যাক। দশমিক বা বাইনারি পদ্ধতির গুণক আর বাইনারি বা দ্বিত্ব পদ্ধতির গুণক। এই তালিকাটা বানানো বাঁ থেকে ডানে — কম থেকে বেশি। আর প্রতিটি গুণকের নিচের ঘরে আমরা তার আঙ্কিক মান দিয়েছি। দুটো মানই দিয়েছি ডেসিমাল নিয়মে। শুধু একদম নিচে একটা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় লাইন যোগ করেছি যেটায় বাইনারি গুণক গুলোর বাইনারি মান। এবং দেখুন তিন আর ছয় নম্বর লাইনদুটো হুবহু এক। এটা সংখ্যা পদ্ধতির আভ্যন্তরীন সৌষাম্য। এমনকি যদি এখানে ডেসিমাল আর বাইনারির জায়গায় হেক্সাডেসিমাল বা অক্টাল মানে ১৬ বা ৮ অঙ্কের নিয়ম আনতাম তাহলেও একই ঘটত। যাকগে, এবার আমাদের ঠাকুর্দার বয়সের ম্যাজিকের মজায় ফেরত আসার সময় হয়েছে।

পদ্ধতি	১-নম্বর ঘর	২-নম্বর ঘর	৩-নম্বর ঘর	৪-নম্বর ঘর	৫-নম্বর ঘর	৬-নম্বর ঘর	৭-নম্বর ঘর	৮-নম্বর ঘর	. . .
ডেসিমাল গুণক	$১০^{০}$	$১০^{১}$	$১০^{২}$	$১০^{৩}$	$১০^{৪}$	$১০^{৫}$	$১০^{৬}$	$১০^{৭}$	. . .
ডেসিমাল গুণকের ডেসিমাল মান	১	১০	১০০	১০০০	১০০০০	১০০০০০	১০০০০০০	১০০০০০০০	. . .
বাইনারি গুণক	$২^{০}$	$২^{১}$	$২^{২}$	$২^{৩}$	$২^{৪}$	$২^{৫}$	$২^{৬}$	$২^{৭}$	. . .
বাইনারি গুণকের ডেসিমাল মান	১	২	৪	৮	১৬	৩২	৬৪	১২৮	. . .
বাইনারি গুণকের বাইনারি মান	১	১০	১০০	১০০০	১০০০০	১০০০০০	১০০০০০০	১০০০০০০০	. . .

০.৮.২.২।। ফেরত এলাম ম্যাজিকে

এবার ঠাকুর্দার উত্তরমালার ওই সংখ্যাটা মনে করুন — ১১০১১০১। এটা একটা বাইনারি সংখ্যা যদি হয়, তাহলে এর মান কত হবে?

পুরো ফর্মুলা ভাই — বসানো যাক। শুধু এখন ডেসিমাল গুণকের জায়গায় বাইনারি গুণক।

$$
\begin{aligned}
১১০১১০১ &= ((১ \times ২^{৬}) + (১ \times ২^{৫}) + (০ \times ২^{৪}) + (১ \times ২^{৩}) + (১ \times ২^{২}) + (০ \times ২^{১}) + (১ \times ২^{০})) \\
&= ((১ \times ৬৪) + (১ \times ৩২) + (০ \times ১৬) + (১ \times ৮) + (১ \times ৪) + (০ \times ২) + (১ \times ১)) \\
&= (৬৪ + ৩২ + ০ + ৮ + ৪ + ০ + ১) \\
&= ১০৯
\end{aligned}
$$

পরখ করে দেখুন, এই প্রক্রিয়ায় যে কারুর বয়স আপনি হিশেব করতে পারবেন। এটা দেখে মজা লাগছে, কিন্তু প্রোগ্রামিং-এর সঙ্গে প্রাথমিকতম পরিচয় যাদের আছে তাদের কাছে স্পষ্ট — এটাই বাইনারি ডিভিশন অ্যালগরিদম। ভেবে দেখুন কারুর বয়স যদি ১২৮ এর কম, মানে ০ থেকে ১২৭ এর মধ্যে হয়, তাহলে সবচেয়ে বেশিবার জিগেশ করতে হলেও সেই সংখ্যাটা হবে ৭। সবগুলোরই উত্তর হ্যাঁ হলে সংখ্যাটা হত ১১১১১১১ মানে ডেসিমাল নিয়মে ১২৭। আর ধরুন আপনার যদি কোনো বাচ্চা এখনো হয়নি, তার বয়স ০০০০০০০ মানে ০। কারুর বয়স ৯৬ হলে হত ১১০০০০০। মানে প্রথম দুটোয় হ্যাঁ, পরের সবকটাই না। এইভাবে যেকোনো সংখ্যাই মিলবে। এভাবেই আসে আঙ্কিক তথ্যের বাইনারি আকার।

০.৮.২.৩।। আঙ্কিক তথ্যের বাইনারি আকার

আমরা আগেই বলেছি একটা জটিল প্রশ্নকে ভেঙে নেওয়া টুকরো টুকরো সরল প্রশ্নে — যার প্রত্যেকটারই উত্তর হ্যাঁ বা না, মানে ১ বা ০। এই প্রশ্নমালাটা এবার পরপর উত্তর দিয়ে গেলেই আমরা তথ্যের বাইনারি আকারটা পাচ্ছি। যেখানে প্রত্যেকটা উত্তরের একটা অবস্থানগত মান এবং একটা গাণিতিক মান আছে। যেমন প্রথম প্রশ্নটার উত্তরের অবস্থানগত মান ৭, গাণিতিক মান ৬৪, পরের প্রশ্নের অবস্থানগত মান ৬, গাণিতিক মান ৩২।

এই সমস্যাটাকে এবার নিছক গাণিতিক ভাবে ভাবুন। মোট কতগুলো আলাদা আলাদা বয়স হতে পারে? শুধু পূর্ণসংখ্যার নিরিখে সম্ভাব্য সমস্ত আলাদা আলাদা বয়সের সংখ্যা ১২৮ — মানে ০ থেকে ১২৭। এই ১২৮ টা আলাদা আলাদা উত্তরকে পরপর লিখে যেতে হলে আমাদের লিখতে হত ০০০ থেকে ১২৮। এই ১২৮-টা আলাদা আলাদা সম্ভাবনাকে আমরা হাজির করে দিতে পারছি একটা সাত অঙ্কের বাইনারি সংখ্যায় — তার অবস্থান মানটা বদলে বদলে। একটা গাণিতিক তথ্যের বেলায় এটা সবসময়েই সত্যি — একটা সংখ্যায় কতগুলো আলাদা আলাদা তথ্য আছে সেটা আমরা পাব সেই সংখ্যাটাকে বাইনারিতে লিখতে যে কটা অঙ্ক লাগে তার সংখ্যা দিয়ে — অবস্থান মান যেখানে হতে পারে ০ বা ১। এই ক্ষেত্রে সেটা ৭।

এবার একটা ছোট্ট তালিকা বানিয়ে ফেলা যাক, কত বিট তথ্য দিয়ে আমরা কত বড় ঘটনাকে বোঝাতে পারব। এক বিট মানে ধরুন একটা খোপ — যেখানে রাখা যায় হয় একটা ০, নয় একটা ১। এই তালিকাটা আমাদের পরের দিনের আলোচনাগুলোতেও কাজে লাগবে।

বিটের সংখ্যা	কতগুলো সম্ভাব্য ঘটনাকে হাজির করা যায়
১	২
২	৪
৩	৮
৪	১৬
৫	৩২
৬	৬৪
৭	১২৮
৮	২৫৬
৯	৫১২
১০	১০২৪

...	...
১৬	৬৫৫৩৬
...	...
৩২	৪২৯৪৯৬৭২৯৬
...	...
৬৪	১.৮৪৪৬৭৪৪০৭ × ১০ [১৯]

০.৮.৩।। একটা টেক্সট ফাইলে ভরে রাখা তথ্যের পরিমাপ

আমরা প্রথমেই একটা টেক্সট ফাইলকে তুলে নিলাম কারণ কম্পিউটারে কাজ করার সময় সবচেয়ে প্রাথমিক একটা কাজই থাকে একটা টেক্সট ফাইলকে বদলানো বা এডিটিং। এই ফাইলটা সে অর্থে বিশুদ্ধ টেক্সট ফাইল নয়, এর মধ্যে অনেক ফর্মাটিং আছে, গ্রাফিক্স আছে — মানে টেক্সট ছাড়া আরো অনেক কিছু। আগেই তো এসেছে এই আলোচনাটা।

বিশুদ্ধ একটা টেক্সট ফাইল এখানে তুলে দিচ্ছি আমরা।

```
# Sample .profile
#
# This file is read each time
  # a login shell is started.
# All other interactive shells
  # will only read .bashrc;
  # this is particularly
  # important for language
  # settings, see below.

test -z "$PROFILEREAD" && . /etc/profile

# Most applications support
  # several languages for their output.
# To make use of this feature,
  # simply uncomment one of the
  # lines below or
  # add your own one
  # (see /usr/share/locale/locale.alias
  # for more codes)

#export LANG=de_DE@euro  # uncomment for German
#export LANG=fr_FR@euro  # uncomment for French
#export LANG=es_ES@euro  # uncomment for Spanish

# Some people don't like fortune.
# If you uncomment the following lines,
  # you will have a fortune cookie
  # each time you log in ;-)

if [ -x /usr/bin/fortune ] ; then
    echo
    /usr/bin/fortune
    echo
fi
```

এই ফাইলটা কী, তা নিয়ে ভাববেন না এখন, প্লিজ। পরে আসবে সেসব বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার। ফাইলটার নাম '.profile' — গ্নু-লিনাক্সের ভারি জরুরি একটা ফাইল, খেয়াল করুন, নামের গোড়াতেই একটা '.' আছে, এদের আমরা ডটানন ফাইল বলে ডাকব পরে, নামের গোড়ায় একটা বিন্দু বা ডট থাকায়, এরা হল গ্নু-লিনাক্সের সিস্টেম ফাইল। এই ফাইলটাতে কোনো ফর্মাটিং নেই, ছবি নেই, বিশুদ্ধ কিছু ইংরিজি অক্ষর আছে। এটা বাংলায় করা

যেতনা, কারণ, এখনো অন্তত যেভাবে বাংলা অক্ষর আমরা ব্যবহার করছি — সেটা সরাসরি কম্পিউটারে যায়না, যায় একটা ছাঁকনি বা ফিল্টারের মধ্যে দিয়ে। লিনাক্সে অঙ্কুর বাংলায় সায়মিন্দুরা করছে, কাজ কিছুটা এগিয়েছেও যেখানে কম্পিউটারে তথ্যের স্তরেই সরাসরি বাংলাকে দেওয়া যাবে হয়ত। কিন্তু এই যে ফাইলটা আমি লিখছি এটা আমার চোখের সামনে স্ক্রিনে মেশিন বাংলা অক্ষর ফুটিয়ে তুলছে, বা প্রিন্টারেও পাঠাচ্ছে — কিন্তু সেটা ওই ফিল্টার করে। যে মেশিনে এই অক্ষর নেই আলাদা করে ইনস্টল করা নেই, সেখানে এটা পড়া যাবেনা। কিছু ল্যাটিন বর্ণমালা আর কিছু কম্পিউটারের নিজের অ্যাসকি চিহ্ন ফুটে উঠবে। সেই মেশিনে এই লেখাটা পড়ার জন্যে পিডিএফ করা হচ্ছে (PDF — **P**ortable-**D**ocument-**F**ormat) — যা সমস্ত অক্ষরগুলোকে ধরুন একটা ছবির মত করে নিজের মধ্যে রেখে দেবে — যাতে যেকোনো মেশিনে সেটা পড়া বা ছাপা যায়।

যাইহোক, এবার এই ফাইলটাকে ভাবুন। এটা আর আগের সেকশনের মত গাণিতিক তথ্য নয়। শুধু সংখ্যা দিয়ে ভরা নেই ফাইলটা। আছে শব্দ, শব্দগুলো তৈরি হয়েছে অক্ষর দিয়ে। শব্দগুলোর মধ্যে মধ্যে ফাঁকা জায়গা বা স্পেস এবং যতিচিহ্ন। এবং কয়েকটা করে শব্দ মিলে এক একটা লাইন। তার মানে ফাইলের মধ্যে কোথায় লাইন ভাঙতে হবে সেই অদৃশ্য যতিচিহ্নটাও আছে।

এই ফাইলটায় মোট ৩৫ লাইন, ১৪০ শব্দ, এবং ৮৯৯ অক্ষর। এই অক্ষর মানে ইংরিজিতে ক্যারেকটার, যার মধ্যে স্পেস আছে। আছে নিউলাইন মানে লাইন ভেঙে নতুন লাইন শুরু করার আদেশসূচক চিহ্ন। এইরকম একটা বিদঘুটে ফাইল বলে এখানে শব্দ বলতে আমরা যা বুঝি তার ধারণাটাও বদলে যাচ্ছে। যেমন, দ্বিতীয় লাইনে ওই # চিহ্নটাও একটা শব্দ বলে বিবেচিত হচ্ছে। ফাইলটার বাইটের সাইজও ঠিক ৮৯৯, একটা কোনো স্পেস কোথাও লাগালেও অক্ষরের সংখ্যা বাড়ছে ১ করে এবং বাইটও বাড়ছে ১ করে। একই জিনিষ ঘটছে কোথাও এন্টার মেরে নতুন লাইন শুরু করলেও।

এবার ভাবুন একটা এই ধরনের ডকুমেন্ট বা লেখার ফাইলে কতটা তথ্য থাকে তার সম্ভাব্য হিশেবটা। ধরুন আপনি ব্যবহৃত বা ব্যবহারযোগ্য সম্ভাব্য সমস্ত চিহ্নগুলোকে একটা তালিকা করছেন। এবার ওই তালিকা অনুযায়ী প্রতিটি অক্ষর মানে ক্যারেকটারকে এক একটা আলাদা সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করছেন। এবার আবার সেই পুরোনো কায়দাটা ব্যবহার করুন — ঠিক কতগুলো সরল প্রশ্নে (মানে হ্যাঁ বা না উত্তর দেওয়া যায় যাদের) একটা ডকুমেন্টের মোট তথ্যকে হাজির করতে পারবেন আপনি আপনার এই তালিকাটা কাজে লাগিয়ে?

ধরুন একটা ৩৫০ চিহ্নের ডকুমেন্টে আপনি মোট বাহান্নটা আলাদা আলাদা চিহ্ন পেলেন। তার মানে আপনার তৈরি চিহ্ন-তালিকাটার সভ্যসংখ্যা হল বাহান্ন। ০ থেকে ৫১ অব্দি বাহান্নটা সংখ্যা দিয়ে এদের আপনি চিহ্নিত করলেন। এবার ওই ডকুমেন্টের যে কোনো একটা চিহ্নকে চিনে নেওয়া যাবে তালিকার একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা দিয়ে। এই সংখ্যাটাকে ধরুন আমরা বললাম সূচক-সংখ্যা। এবার ওই চিহ্নটা — যা কোনোভাবেই একটা গাণিতিক সত্তা নয় — তাকে এবার বুঝছি ওই সূচক-সংখ্যাটা দিয়ে। তার মানে এবার ওই অগাণিতিক চিহ্নটারও একটা সাইজ পেয়ে গেলাম আমরা — ওই সূচক-সংখ্যাটার সাইজ। কারণ, এই সূচক-সংখ্যাটা পেলেই আমাদের তালিকা থেকে আমরা চিনে নিতে পারব ওই চিহ্নটাকে। তার মানে এবার গোটা ডকুমেন্টটার সাইজ কী দাঁড়াল? যতগুলো চিহ্ন এসেছে ডকুমেন্টটায় তাদের প্রত্যেকের সূচক-সংখ্যার সাইজ গুণ যতবার করে তারা প্রত্যেকটা এসেছে। মানে, একটা সম্পূর্ণ অগাণিতিক ফাইলেরও একটা গাণিতিক পরিমাপ আমরা পেয়ে গেলাম।

কিন্তু এই পরিমাপটা কোনো অর্থ তৈরি করতে পারবে, বা সেই ফাইলটা থেকে আমরা ডকুমেন্টটাকে বানিয়ে ফেলতে পারব শুধু ওই প্রথমেই বানিয়ে ফেলা তালিকাটার সাপেক্ষে। ওটা না-থাকলে আমরা বিশ বাঁও জলে। পরে আমরা দেখব এই তালিকাটার কিছু সর্বজনগ্রাহ্য মানদণ্ড বা স্ট্যান্ডার্ড আছে — যেমন অ্যাস্কি বা এক অর্থে ইউনিকোড। যে তালিকাটা সবাই মানে। এতে সুবিধেটা এই যে একটা তালিকা দিয়েই সবার কাজ চলে যায়। কেউ আপনাকে এবার একটা ফাইল পাঠাল — যাতে পরপর শুধু সংখ্যা, আর বলে দিল যে এটা টেক্সট ফাইল। আপনি তালিকাটা বসালেন, ঘ্যাচাঘ্যাঁচ পড়ে ফেললেন। এই প্রক্রিয়াটার মূল প্যাঁচটা এইখানে — চিহ্নকে সংখ্যা করে নেওয়া। এখানে মূল ডকুমেন্টটাও, তার ইলেকট্রনিক আকারটাও বদলে যাচ্ছে। যা ছিল একটা চিহ্নের সমাহার, হয়ে দাঁড়াচ্ছে একটা সংখ্যার সমাহার। আমাদের উদাহরণটা ভাবুন — ০ থেকে ৫১ অব্দি বাহান্নটা আলাদা আলাদা চিহ্ন

আছে। এবার আগের পাতায় দেওয়া কতগুলো বিট দিয়ে কতগুলো সম্ভাব্য ঘটনাকে হাজির করা যায় তার তালিকাটা দেখুন। এখানে ৫-টা বিট ম্যাক্সিমাম ধরতে পারে ৩২-টা ঘটনা, আর ৬-টা বিট পারে ৬৪-টা ঘটনা। তার মানে আমাদের ৬-টা বিট লাগবে প্রত্যেকটা চিহ্নকে বোঝাতে। ৬-বিটের একটা ছক মোট ৬৪-টা আলাদা আলাদা চিহ্নকে হাজির করতে পারবে। বরং আমাদের বারোটা রয়ে যাবে অব্যবহৃত। এবার এই ডকুমেন্টটার আকার কী দাঁড়াবে? মোট যত চিহ্নের ডকুমেন্ট — এই উদাহরণে সেটা ৩৫০ — তাকে গুণ করে দিন ৬ দিয়ে। পেয়ে গেলেন আপনার ফাইলে মোট বিটের সংখ্যা।

এই নিচের অংশটাকে একটা ভিশুয়াল চ্যাংড়ামো বলতে পারেন। আপনি কি আন্দাজ করতে পারছেন — এই বস্তুটা কী? পারা সম্ভব না — এই যে পিডিএফ ফাইলটা আপনি পড়ছেন — এই ফাইলটাকেই কোনো এক্সপিডিএফ বা জিজিভি বা অ্যাক্রোরিড

‰dRiTS‰•¾/»[Ü&&ú^ÜPQYÜ•˘7D@•TF©Šb˚!$†$d´I˚a ‹ƒ¯•
!,IØ·!`˙•´‘º Öe:.c Ö©3=§Óö´••:§•ÿöÜ?wýìù¾{••Wì=ñ|ûÆì••7.•é]2K\Úµ*!t•,B yöæÀàÃ'q¦N±DÁËTrD|•
£àÉ>úR•L!à˘R˘iireF˙G! ˆ¥2Iª'« qR˜\•ˆ#õÆW>6á‰••'DÅ•óyÞ´ˆçÇþ, Ç-
dH•^@v„˜/•óx2 ˜ïMúoe¨…„ìØ•²ÓŸ•þqe*;%‡ý'û•'Ç?N"Ëàˆþ •^˜"ˆT t …K"À•`• -
ÀV˜¯•`'Àn"ï˜8 @.Àa #˚DÒà$ˆŸ´$ˆœ˜H"Àm »-"ˆ4ˆRF¯= •@`ˆ¤,••`••`ˆ_!H•À- q¯&´ª´òHPLD¶°a-
â‹lY•¨H••Ñ•Cˆ'$Àiâ9¸Hä"i4)"‡,È´5¡„p•¨Õ•êIV°#mó˙¼ønÂM•C& ;¤¨¤iÒsøy˘ßc`÷~• ¼zÏ•V•þI¼KÚDJ"
e'*ÉçÈ¨ò{J,ÅJ]@UQ?Ð¢i÷çEÍß:ÿò,ý£•lè¨é®Å¶%ç-ú--YújÙñe¯-•>   úd''Èøe…aÅô§f-
¦OÏJîÊ9fëèªÕ«^®nD×£9¨"»Ë®^#]3¾vd e=º¾fÃÅ?ú¶l"IÚô³ßˆ¿ oqo½µ-Ä »¿Éÿq"-j}•v*¬-
ì/ûwî•îŸ=•~ÀvpÍÁöCìC=‡×•®•
w•¹•±,¢"âÅÑüHzdNä»¨ãQ=Ñ•¢s¢g 86•Ã‹•ˆ]•kŠýåxA•Ä%Æý#^•_êI
{*èçÔ£_¿-y÷r¼×ùp•±´Náó] ï$Î,•10æ,)®42^'¢\Ô˘ð7Ä
'úÜ-™ä¹xÑEiz´M[V\ a•?ðçç¯'-º3[„R¥L©´i
úªŠŠJTVø›ŒS¬d¡Ý\¥7•®av"Ën6ÑÛ†ðƒì›O•¹…åºÒb¬C«®ÎaÉs•òìfE««{äíÖ©D¬•O¢œd>åiyÊ¸g^F¸N
Ê:"µö×éÍ&•¦¬'kótJ53îÆ•üÓk¨õ¥¾‡5f×H‹ÊòÕ…˜g£ÇÍ•¹¢ÆÄuÃ •ÚÝ˙š¯öRÞ•"•ÿÍ}ÿÉ¨Ýmt[ÜÓN¤©íQ-
^Ý‰Çvº¾Î&¦3ZsÉy7¯ßf~g ðà••3MÎJ'æg².œé}˜,‰N‹'Y§ùÝí¥XMUuµ±'63BIw'ÿû˜¥ß«U<…ÏË<-
b¦ô ¼í´ZZúÑú¢:u.3=U•ÍÍhîÈ@¥m¼•¥oeM>•"ÊŸ=" ±Ü÷zÆ*±Š‡ØýâücÖã¯G¦GR&…V,%A®Q°"y¦ÆÖ
•‰{˜Xjë¤à   «®±Jß,ñbÏÄ2 Z.4&¢•ûx,CnË•Ð\/ê"º…í4N'@ ÍÊÕ˜•-]¿ýÆ ê½-1Å26^Ó×c•ådE-
V"d••J-q¶5·
 Z£JÃ¼|'•ÃOkè•£ô7ÝÓ ÅIÚ¾•B~šø©•?5DÄ?ÌìfÜ" ½qœ•-tö´°AeÖ×TV×bVw³™ÕTU¬½'œ•/Á&/""˙šz{˜
E"GQ¦S£M_8•cc¼c-¨YV_PÙdh®6-¬2•»
Öº•Kvu´Í¤2fª™ª¢lU>jÒ^1ä²ø9ò
A‡¼Ïj«©1b†¼u´"ËáGx˜{_àõëP¹‰ìù#Nx¿•÷c½•½ó¨IëÐ6cÍuÖ>¨Ó'×'|•Uvfºòmj"Oqr´O#§Ñß•§G¦:Gñåã
ÝN¯×
â"fÇ•_†û0"J"Ä*íÎ^©j´••XuF³˘³Ùû»ºZh-
¦&ƒ™emÎOéÀ,©ƒ©ä•ë·T¾"<÷Œ2è½ø51ålq"ÔC•»'è3U2¬üò²]åäÕˆró"*¥šVRœ§+f•)ÌC¹•¾ÙÂÀK¨CON
\Ð••-•cW) ¥Š†<V-J••Õïìoq
? -‡uã¡sÄ2ê$Wi"²²äyr•ÆÅ••¨r* ,Åq´ãþÐWVg• îy¬³âOÇ¿w""ÃD ü
#•ú9¾ö} ¾²\w-J-÷å2w•µµ˘¨EcÉµhh6ª¶]7ú'y½òY•Í-Ïì-©¡ÕèŠªJY•ÏÊàÏ±˙<" _ýõ§=••ºÇÕü
Á-••~Œ-
Bòí¦Ñ‰QæÔ…^±Bš'ÌlUYkëôF#jÔêµL¹˜•/Bé•Óx'•Á‹q¨ÃSI•¹ä•éWÓ¨¤ÿGbÿ•#Ó•ÕÖa³µ·gÙ¤
2eV&ú?
ËÄ©ÉüŒã Ù•ÌnéLg_¨ß·}ß2mw×£ëxLµ²êîV•TPÀ#á¾r „œ@B¸Ñ@„„„œ$„$ ‹@˚WŒ´TDñØˆ
v•êº»•Övq-]Ù_¦o;ÓØ?à™ù>ßg•ï÷"˙Ùˆ,œÉ›ñw¯o 3¸<qy˜ø"Æ„~$gxC%´Äksø{;¬í*ì59•˚ÿi'ûÊ
H>²»Ó-
ÒVQiõˆ˙®•âxGF¬s¨R©íÒn¨¯âLÊáB~ Î×Œµ/µµ·´ROi=˘Óˆ Ã¦ýk•³9Ãc® î¶¤ŠòüBø¢eŸ'•
HõÁÆofà•Ï½ÇKèÉ«Ós•,î-•.'²¯[o…=Ìèv´ÕÜdÒRÁæÍ 'ÜÝ®hk…yˆ•-]:<Ü•ßåå$ÐL•nG ¶˜
·KiÂð="l»Èî6Z¬•‰YÐÖÜÑÞ,æƒ

জাতীয় কোনো পিডিএফ ভিউয়ার দিয়ে না-খুলে খোলা হয়েছে একটা বিশুদ্ধ টেক্সট পড়ার সফটওয়ার দিয়ে — ফর্মাটিং ছাড়া টেক্সট যাতে পড়া যায়। ফাইলটার একদম শুরুটা এখানে তুলে দিলাম। লাইনভাঙাটা একটু বদলালাম, জায়গা বানাতে। পিডিএফ ভিউয়ার সফটওয়ারগুলো এই ফাইলটা পড়ে এবং স্ক্রিনে বা প্রিন্টারে পাঠায় ফর্মাটিং-সহ ওই টেক্সট যা এতক্ষণ আমরা পড়তে পড়তে এলাম।

এবার আমাদের দেওয়া '.profile' ফাইলটার এই মাপগুলোর সঙ্গে আলোচনাটাকে মিলিয়ে নিন। শুধু ওই ক্ষেত্রে একটা জিনিষ মাথায় রাখবেন — আট বিটে এক বাইট। আর এক এক বাইট সেখানে এক একটা চিহ্নকে হাজির করছিল। কেন — সেই আলোচনায় আমরা এখুনি যাচ্ছি।

০.৯।। বিট বাইট ওয়ার্ড — স্মৃতির একক

ধরুন একটু আগের আমাদের উদাহরণের কাল্পনিক ডকুমেন্টটাকে। যাতে মোট চিহ্ন ছিল ৩৫০-টা, ৫২-টা আলাদা আলাদা চিহ্নের সমাহার। ধরুন এই ডকুমেন্টটা লাবণ্য পাঠাল অমিত-কে। এবং আরো দেখা গেল যে লাবণ্য আর অমিত-র (বস নিজে 'অমিতের' লেখা পছন্দ করতেন না, লেখা চাই 'অমিত-র') মধ্যে ডকুমেন্টগুলোতে ওই বাহান্নপিস চিহ্নই থাকে। এবার লাবণ্য আর অমিত তাদের সরোবরের দুপাশে দুজনের প্রাসাদের চুড়োয় ছপিস করে লালবাতি লাগাল। (লালবাতিটা আমি না বস নিজেই বলে গেছেন। রঞ্জিৎ সিং বলেছিলেন না, হিন্দুস্থান একদিন লালমে-লাল হয়ে যাবে — তারই বাংলা ভার্শন হয়ত।) এবার জ্বলে থাকা মানে ১ আর নিভে থাকা মানে ০। বেড়ে এখন চিঠিচালাচালি চলছে লাবণ্য আর অমিত-র মধ্যে। এবার প্রশ্ন উঠছে হারাধনের ওই বারোটি উপরি ছেলে — তারা কি কিছুই করবেনা — পড়ে থাকা ছ-বিটের ওই বারোখানা সমাহার। করবেনা আবার কী — আলবত করবে — রিতুর পর্নো থেকে, একটু সফট যদিও, আপনি হদিশ পেতে পারেন — আর কী কী পোয়াবারো চলবে, মানে চলতেই পারে ওই পড়ে থাকা বারোয়। মজার কথা কী বলুন তো — ঠিক এটাই ঘটেছিল টেলিটাইপরাইটারের বেলায়। পড়ে পাওয়া চোদ্দআনার মত এই ফাউ বিটসমাহারগুলোয় কিছু টেক্সটোত্তর চিহ্নকে বুনে দেওয়া হয়েছিল যা যাবে টেক্সট-এর সঙ্গেই।

ইংরিজি ভাষা ব্যবহার করে ল্যাটিন বর্ণমালা — যাতে ছাবিবশখানা অক্ষর। আর প্রত্যেকটারই দুটো করে হাত আছে — বড় হাত আর ছোট হাত। মানে বাহান্ন। দশখানা অঙ্ক মানে ০ থেকে ৯। হল বাষট্টি। নয় নয় করেও কয়েকপিস যতিচিহ্ন। পিরিয়ড বা ফুলস্টপ, কমা, সেমিকোলোন, কোলোন, যোগ চিহ্ন, বিয়োগ চিহ্ন, অ্যাপোস্ট্রফি বা উর্দ্ধকমা, এবং কোটেশন মার্ক ইত্যাদি। মোট এতেই দাঁড়াল সত্তরখানা। কিন্তু কিন্তু একদম গোড়ার দিকের টেলিটাইপরাইটার ব্যবহার করত পাঁচ বা ছয় বিটের কোড। মানে ৩২ বা ৬৪-টা আলাদা আলাদা সম্ভাব্য চিহ্ন। তখন এল সাত বিটের ব্যবস্থা। মানে ১২৮-টা আলাদা আলাদা চিহ্নের সম্ভাব্যতা। যাতে এই সবগুলো তো দেওয়াই যাচ্ছে, যাচ্ছে আরো কিছু। ফাউ। তখন যে সর্বজনগ্রাহ্য মানদণ্ডটা তৈরি হল সেটাই অ্যাসকি (ASCII — **A**merican-**S**tandard-**C**ode-for-**I**nformation-**I**nterchange)। এতে সাত বিটের ব্যবস্থা। এই ১২৮-টা সম্ভাব্য চিহ্নের মধ্যে ৯৬-খানায় এল সেই সব চিহ্ন — যারা ছাপা হবে, প্রিন্টেবল ক্যারেকটারস। মানে অক্ষর, সংখ্যা, যতিচিহ্ন ইত্যাদি। অন্য ৩২-টা হল সেই টেক্সটোত্তর চিহ্নরা। এদের বলে কন্ট্রোল ক্যারেকটারস। এদের মধ্যে আছে ক্যারেজ রিটার্ন — এই নামটাও আমরা আজো ব্যবহার করছি। কিন্তু আসলে এটা আসছে সেই ম্যানুয়াল টাইপরাইটারের সময় থেকে — যখন ক্যারেজটা তার বেঁকা হাতল সহ ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হত টাইপ করার সময় নতুন লাইনে যেতে হলে। আছে লাইন ফিড — মানে পাতায় এক লাইন নেমে এসো। এবং আছে সেই বাঁশরীধ্বনি। কোড ৭। যার প্রসঙ্গ থেকেই এই আলোচনার শুরু। টেলিটাইপরাইটারে ঘন্টা বেজে ওঠার আদেশ। কারণ লোককে তো টের পেতে হবে যে বার্তা এল। মজার কথা জাক লাকাঁর সেই লুপ্ত মেটাফরের মত আজো সেই একই কমান্ড তার অ্যাসকি কোড সহ ব্যবহার হয়ে চলেছে (আমরাও করব, ব্যাশ স্ক্রিপ্ট নিয়ে আলোচনায়। দশ আর এগারো নম্বর দিনে), যদিও আজ আর ৭-বিট কোড নয়, এখন ন্যূনতম এককটা আট বিট, মানে এক বাইট।

১৯৬০-এ, আইবিএম ৩৬০ মেশিনের সময় থেকে এল এই ৮-বিটের কোড। এর মূল কারণ ছিল, এক, এতে ঠিক দ্বিগুণ সংখ্যক নতুন চিহ্ন তারা আনতে পারলেন। আর ক্রমশ বাণিজ্যের তথা ইলেকট্রনিক যোগাযোগের জগতটা এত দ্রুত বেড়ে চলেছিল যে রোজই নতুন নতুন চিহ্নের প্রয়োজনও বাড়ছিল। আর, দুই, এতে একটা তথ্য সমাহারের মধ্যে বিট-গুলোকে আরো দক্ষভাবে ব্যবহার করা যাচ্ছিল।

এবার আমরা আরো অনেক ভালো করে বুঝতে পারব এই লেখাতেই ০.৮.৩ নম্বর সেকশনে আমরা বিশুদ্ধ টেক্সট বলতে কী বুঝিয়েছি। যেসব ডকুমেন্ট ফাইলে ব্যবহৃত চিহ্নগুলো ০ থেকে ১২৭-এর মধ্যে থাকছে তারাই বিশুদ্ধ টেক্সট ফাইল। ১২৮ থেকে ২৫৫ অব্দি চিহ্নগুলো মানে এক্সটেন্ডেড অ্যাসকি কোডকে কাজে লাগিয়ে যে জটিলতর ফর্মাটিং সেগুলো ওইসব ফাইলে নেই।

যেমন বললাম, স্মৃতির ন্যূনতম একক এখন এই আট বিট। যাকে ডাকা হয় এক বাইট বলে। কিন্তু দ্রুতগতির পিসি আর অপারেটিং সিস্টেমরা যখন তাদের কম্পিউটারের স্মৃতি (মেমরি এবং ভাঁড়ার দুই-ই) ব্যবহার করে তারা একটা

বাইটের একককে করেনা, করে ২, ৪, বা ৮ বাইটের একককে। তখন সিস্টেম দাঁড়ায় ১৬ বিট, ৩২ বিট বা ৬৪ বিটের। এবার দেখুন তো, এই লেখাটার ১০ নম্বর পাতায়, এক্সপ্যানশন স্লটের ছবিতে গোটাটা আপনি আন্দাজ করতে পারছেন কিনা? স্মৃতিকে ব্যবহার করার এই ২, ৪ বা ৮ বাইটের, মানে ১৬, ৩২ বা ৬৪ বিটের একককেই তখন আমরা ডাকি ওয়ার্ড বলে। কম্পিউটারের ভাষাচর্চার একক। এই নিরিখেই সে লেখাপড়া করে। মানে স্মৃতিকে লেখে র‍্যামে রমে বা ডিস্কে, এবং প্রয়োজন মোতাবেক সেখান থেকে পড়ে।

অ্যাসকি চিহ্ন-তালিকা।। অ্যামেরিকান স্ট্যান্ডার্ড কোড ফর ইনফরমেশন ইন্টারচেঞ্জ-এর এই তালিকাটা তৈরি করা সাত-বিট কাঠামোয়। এর পরে তৈরি অনেক আট-বিট তালিকা (যেমন আইএসও-৮৮৫৯-১, যা গ্নু-লিনাক্সের স্বাভাবিক চিহ্ন-তালিকা) তার নিচের অর্ধেককে এই তালিকাটা ব্যবহার করে। অ্যাসকি ইংরিজি বর্ণমালার জন্যে তৈরি। এর আন্তর্জাতিক বিকল্পটার নাম আইএসও-৬৪৬। এটিঅ্যান্ডটি-র ইউনিক্সের ভার্শন ৭-এ অ্যাসকি ম্যানুয়াল প্রথম আসে। ১৯৬৮-তে এই অ্যাসকি চিহ্ন-তালিকা প্রকাশ করে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা স্ট্যান্ডার্ডস ইনস্টিটিউট। এখানে আমরা তালিকায় চিহ্নের মানটা দিয়েছি ডেসিমাল পদ্ধতিতে। এখানে আমরা বর্ণমালার চিহ্নগুলো এবং অঙ্কের চিহ্নগুলো এবং যতিচিহ্নগুলো দেখাইনি। শুধুমাত্র কয়েকটা কন্ট্রোল ক্যারেকটার বা ফাউ। যারা টেক্সটোত্তর অর্থ বহন করে টেক্সট ফাইলের মধ্যেই। তাও সবগুলো না, কয়েকটা মাত্র। তালিকায় ০ নম্বর চিহ্নটা বোঝায় নাল বা কিছু-না। এর মানে কিন্তু ০ নয়। ০ একটা আলাদা চিহ্ন। নাল দিয়ে সচরাচর একটা স্ট্রিং বা চিহ্নমালার শেষ বোঝানো হয়। আমরা পরে দেখব এসব।

চিহ্নের মান	কিবোর্ডের চাবি	কী বোঝায়
০	<CTRL> + @	নাল বা কিছু-না — সচরাচর স্ট্রিং-এর শেষ
১	<CTRL> + A	হেডিং শুরু
২	<CTRL> + B	টেক্সট শুরু
৩	<CTRL> + C	টেক্সট শেষ
৪	<CTRL> + D	ট্রান্সমিশন শেষ
৫	<CTRL> + E	জিগেশ করো বা খোঁজো — এনকোয়ার
৬	<CTRL> + F	স্বীকার করো — অ্যাকনলেজ
৭	<CTRL> + G	বেল — ঘন্টা বাজাও
৮	<CTRL> + H	ব্যাকস্পেস — কার্সরের আগের চিহ্ন মোছো
৯	<CTRL> + I	হরাইজন্টাল ট্যাব — পাশাপাশি ডানে সরে যাও
১০	<CTRL> + J	লাইন ছাড়ো — লাইন ফিড
১১	<CTRL> + K	ভার্টিকাল ট্যাব — খাড়া নিচে নামো
১২	<CTRL> + L	ফর্ম ফিড — নতুন পাতা
১৩	<CTRL> + M	ক্যারেজ রিটার্ন বা নতুন লাইন
১২৭	<ALT> + 127	ডিলিট — কার্সরের পরের চিহ্ন মোছো

কমান্ডগুলো কী করে পড়ার সময় মাথায় রাখুন এখানে একটা টেলিটাইপরাইটারকে ভাবছি আমরা। একটা বার্তার ট্রান্সমিশন যা একটা টেলিটাইপরাইটার মেশিনকে খুঁজছে। ঘন্টা বাজানোর চিহ্নটা দেখুন, তাহলেই ব্যাপারটা সহজ হবে। বার্তাটা মেশিনে পৌছনোর পর চারদিকের লোকজনকে তো সচেতন করতে হবে, নতুন একটা বার্তা পৌছলো। সেইখান থেকে ঘন্টাটার প্রয়োজন ছিল ন্যূনতম বার্তার কোডেও। এই দশমিক সংখ্যা '০৭' এই কোডটা পরেও রয়ে গেছিল, আমরা পরে ব্যাশ শেল করতে গিয়ে দেখব, এই সংখ্যা দিয়েই সেখানে ঘন্টা বাজানো যায়, এখনো। যখন সেই অর্থে ঘন্টাটা আর দরকার নেই, কারণ ঘন্টার ইতিহাসটাই মরে গেছে। এই কোডটা একটা লুপ্ত মেটাফর, মরে যাওয়া ইতিহাসটা না-জানলে যার অর্থ কিছুতেই উদ্ধার করা যায়না।

এখানে এই অ্যাসকি তালিকার একটা জিনিষ নিয়ে আমাদের প্রশ্ন উঠতে পারে, পরেও আবার আসবে প্রসঙ্গটা, সেটা একটু স্পষ্ট করে নেওয়া যাক। তবে এই একদম প্রাথমিক স্তরের পাঠক এই প্রসঙ্গটা বুঝতে না-ও পারেন, তা নিয়ে চিন্তিত হবেন না, পরে ঠিক বুঝে যাবেন। এই শেষ প্যারা কটা অনেকেরই একটু কঠিন লাগতে পারে, পরের প্রয়োজনের কথা ভেবে লিখে রাখতে হচ্ছে। এমনকি এখন এই প্রসঙ্গটা বেমালুম ছেড়ে দিয়ে পরে ফেরত আসতে পারেন, টেক্সট নিয়ে যেখানে বিশদতর আলোচনা আসবে।

এইমাত্র দেওয়া এই অ্যাসকি তালিকায় দুটো সংখ্যা দেখুন ‘১০’ আর ‘১৩’। প্রথমটা, ‘১০’, লাইনফিড, মানে লাইনছাড়ো, বা একদম কাঁচা রকমে বললে, প্রিন্টারকে বা স্ক্রিনকে আরো একটা লাইন খাওয়াও, ইংরিজিতে সচরাচর এটাকে ‘LF’ বলে উল্লেখ করা হয়। দ্বিতীয়টা, ‘১৩’, ক্যারেজ-রিটার্ন বা নতুন লাইন, ইংরিজিতে এটাকে ডাকা হয় ‘CR’। আপাতদৃষ্টিতে, দুটোকেই তো একই বলে মনে হচ্ছে, নিট কাজটা হল নতুন লাইন শুরু করা। তাহলে?

এই খ্যাঁচটা সচরাচর কম্পিউটার ক্যাওড়ামিতে ‘^M’ মিস্ট্রি বা ‘CR-LF’ ইশু বলে ডাকা হয়। সমস্যাটা আসলে দেশি-বিদেশি মিক্সড-এর। এটা গ্নু-লিনাক্স তথা যেকোনো ইউনিক্সের সঙ্গে মাইক্রোসফট ডস বা উইনডোজ জগতের একটা পারস্পরিকতার সমস্যা। শুধু যদি একটা সিস্টেমে থাকেন আপনি, সেখানের টেক্সট নিয়েই কাজ করেন, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা হল একটা থেকে অন্যটায় যেতে চাইলে। আর গ্নু-লিনাক্স তথা যে কোনো ইউনিক্সকে কেন একটা ব্রাকেটে নিয়ে আসছি, বা এই বর্গটা দিয়ে আমরা ঠিক কী বোঝাচ্ছি সেটা স্পষ্ট হওয়ার জন্যে আপনাকে দিন চার আর পাঁচ অব্দি ওয়েট করতে হবে।

এখন জাস্ট এইটুকু মাথায় রাখুন, কম্পিউটার অবতার আর্বিভাবের শঙ্খরবে যখন মাতল ত্রিভুবন, সেই সময়টায়, সেটা বেশ পুরোনো সময়, খুব আলাদা, ভারত তখনো ভাঙেনি, টিভি আসেনি এই গ্রহে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে, আরএসএসের হাতে গান্ধী খুন হতে দু-এক বছর দেরি আছে, রবীন্দ্রসঙ্গীত নামটাই আসেনি ধরাধামে, রবিবাবুর গান তখনো এমনকি নিজের সুরে গেয়ে রেকর্ডও বার করা যেত, সেই সময় থেকেই সমস্যাটার শুরু, টেক্সট এবং সংখ্যার সম্পর্কটা ঠিক কী হবে। তারপর, কম্পিউটার ব্যবহার ক্রমে একটু একটু করে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চালু হল প্রথম প্রথাটা, ইউনিক্সের পূর্বপুরুষদের হাত ধরে এল, নতুন লাইন বোঝাতে লাইনফিড বা ‘LF’। এই পাঠমালাতেই পাবেন, তখনো ডস আসতে ঢের দেরি। পরে, ডস যখন এলো, পৃথিবীর ধূর্ততম বানিয়াদের একজন বিল গেটসের হাত ধরে, তখন সেখানে চালু হল, দুটোকেই একই সঙ্গে ব্যবহারের প্রথা, মানে প্রতি লাইনের শেষেই ক্যারেজ-রিটার্ন আর লাইনফিড, মানে ‘CR-LF’।

তাই এই ডস, এবং পরে উইনডোজ প্রথায় ‘CR-LF’ এই দুটো চিহ্ন দিয়েই লাইন-বোঝানো রকমে লেখা টেক্সট গ্নু-লিনাক্স তথা যে কোনো ইউনিক্স সিস্টেমেই পড়তে গেলে, বাড়তি একটা ‘^M’ দেখা দেয়, ইম্যাক্স দিয়ে কোনো উইনডোজে লেখা ফাইল খুললেই দেখবেন, প্রতি লাইনের শেষে একটা করে ‘^M’। এর মানে ওই বাড়তি ক্যারেজ-রিটার্নটা। আবার গ্নু-লিনাক্সে লেখা টেক্সট উইনডোজে পড়তে গেলে গোটাটা ঘেঁটে যায়, লাইন ভাঙা গুলো দেখাতে পারেনা সঠিকভাবে। এই জন্যে সমস্ত ইউনিক্স বা গ্নু-লিনাক্স সিস্টেমেই নানা অ্যাপ্লিকেশন দেওয়া থাকে, আমি সচরাচর ব্যবহার করি, ‘unix2dos’ বা ‘dos2unix’, নাম থেকেই বুঝতে পারছেন, তাদের কাজ কী, শুধু ‘2’-টাকে ইংরিজি শব্দ ‘টু’ হিশেবে পড়বেন।

এই কাজটা আপনি সরাসরি নিজের হাতেও করতে পারেন, কাজটা বেশ সিম্পল। ধরুন, একটা টেক্সট ফাইল গ্নু-লিনাক্স তথা যে কোনো ইউনিক্স সিস্টেম থেকে আপনি ডসে বা উইনডোজে আনছেন। এই মাত্র আমরা দেখলাম, লাইনফিড বা ‘LF’ মানে অ্যাসকি মান ‘১০’। আর ক্যারেজ-রিটার্ন বা ‘CR’ মানে অ্যাসকি মান ‘১৩’। আর, গ্নু-লিনাক্সে যেখানে লাইনের শেষে ‘LF’ আছে, উইনডোজ প্রতিবেশে সেই ফাইল পড়তে গেলে প্রতিটি লাইনের শেষে আপনার ‘CR-LF’ মানে ‘১০’ আর ‘১৩’ দুটোকেই পেতে হবে। খুব সোজা, অ্যাসকি-তে টেক্সটা খুলে প্রতিটি ‘১০’ মানের আগে একটা করে ‘১৩’ গুঁজে দিন। ঠিক এটাই করে বদলানোর প্যাকেজগুলো। এবার বেমালুম আপনি সেটা উইনডোজ প্রতিবেশে পড়তে পারবেন।

উইনডোজ সিস্টেমে একজন সাধারণ ব্যবহারকারীর এসবের দরকার পড়ে না, কারণ, উইনডোজ কোনো গ্নু-লিনাক্স সিস্টেমকে দেখতেই পায়না। যেমন আমার মত যাদের সিস্টেমে উইনডোজ আর গ্নু-লিনাক্স দুটোই আছে, তাদের গ্নু-লিনাক্স থেকে দেখলে গোটা হার্ডডিস্ক আয়তনটা দেখা যায়, কিন্তু উইনডোজ দিয়ে দেখলে সিস্টেম দেখায় শুধু সেটুকু হার্ডডিস্ককেই যেটুকুতে উইনডোজ রয়েছে। এটা উইনডোজ সিস্টেমের একটা অক্ষমতা, পরে আমরা ভালো করে দেখব এবং বুঝব এসব। কিন্তু, তাই, গ্নু-লিনাক্স সিস্টেমকেই যেহেতু দেখতে পাওয়ার সাধ্য নেই উইনডোজের, তার ফাইলকে আলাদা করে বোঝাটা তো আরো দূরবর্তী হয়ে পড়ছে। তবে উইনডোজ সিস্টেমে বসেও যারা

সিরিয়াস কাজ করেন, তাদের জন্যে উইনডোজ প্রতিবেশে গ্নু-লিনাক্স টেক্সট ফাইল পড়ার প্যাকেজও আছে। তবে গ্নু-লিনাক্স পার্টিশনকে দেখতে পাওয়ার ক্যালি উইনডোজের এখনো হয়নি।

অনেক লম্বা হয়ে গেল এই শূন্য নম্বর দিনটা। কিন্তু কত জরুরি কিছুই তো বলা হলনা। এর মধ্যেই তথাগত অনেকগুলো খুঁত ধরে দিল। ও খুব ভালো রিডার। তার একটা সংশোধন এটাতেই করে দিলাম। আমি ভুল করে ফাইলগুলোকে এক্সিকিউশনাল লিখছিলাম, ও খেয়াল করিয়ে দিল যে এটা এক্সিকিউটেবল হবে। এটা তবু ছোটখাট। পরের অনেকগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ ভুল। বলছিলাম না, আমরা লিনাক্সীরা এভাবেই কাজ করি। আমাদের কমিউনিটি মিলে।